সেরা মুসলিম মনীষীদের

জীবনকথা

১

নাসির হেলাল

মনীষী সিরিজ-১

সেরা

মুসলিম মনীষীদের
জীবনকথা

নাসির হেলাল

সুহৃদ প্রকাশন
৩৮/৩, বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭২-১৫৩৩৬২

www.pathagar.com

সেরা মুসলিম মনীষীদের জীবনকথা
নাসির হেলাল
প্রকাশক
জিলহজ আলী
সুহৃদ প্রকাশন
কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাঃ ০১৭১২ ১৫ ৩৩ ৬২
প্রথমপ্রকাশ
প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৯৯৯
দ্বিতীয় প্রকাশ : বইমেলা ২০০৬
তৃতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১২
স্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ
মশিউর রহমান
লিপিসজ্জা
সুহৃদ কম্পিউটার
মুদ্রণ
আল-আকাবা প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা
মূল্য
একশত টাকা মাত্র
ISBN : 984-632-054-X

Sera Muslim Monishider Jibonkatha by Nasir Helal. Phblished Zilhoz Ali, Surid Prokason. **Price: Tk. 100.00**

www.pathagar.com

উৎসর্গ

অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক মুজাহিদ পত্রিকার সম্পাদক
মুস্তানুর রহমান
শ্রদ্ধাভাজনেষু

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

গবেষণা

১. যশোর জেলার ছড়া
২. যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার
৩. বারবাজারের ঐতিহ্য

উপন্যাস

৪. একাত্তরের প্রেম
৫. তিন পুরুষ
৬. অবাঞ্ছিত কলঙ্ক
৭. খুন
৮. প্রেমের অনেক রং

রহস্য উপন্যাস

৯. বঙ্গ সেনার কবলে
১০. অপারেশন কাশ্মীর
১১. গ্রোজনীতে শ্বেত ভল্লুক
১২. বসনিয়ায় রক্তনদী
১৩. মৃত্যুপুরী

জীবনী

১৪. বেহেশতের সুসংবাদ পেলেন যাঁরা
১৫. মু'মীনদের মা
১৬. মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা
১৭. বিশ্বনবীর পরিবার বা আহলে বাইত
১৮. নবী দুলালী
১৯. জাতীয় জাগরণের কবি গোলাম মোস্তফা

ছড়া

২০. আগুন ঝরা ছড়া

নাটক

২১. মুন্সী মেহেরুল্লাহ

ইসলামী সাহিত্য

২২. হাদীসের পরিচয়
২৩. কোরআন-সুন্নাহর আলোকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী

সম্পাদনা

২৪. মুন্সী মেহেরউল্লা রচনাবলী (১ম খণ্ড)
২৫. মুন্সী মেহেরউল্লা রচনাবলী (২য় খণ্ড, যন্ত্রস্থ)

www.pathagar.com

ভূমিকা

যে জাতি তার গুণী ব্যক্তিদের মূল্যায়ন করে না, সে জাতি বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। সত্যি কথা বলতে কি বাঙালী জাতি, বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানের ক্ষেত্রে এ কথাটা হাড়ে হাড়ে সত্য। তারা তাদের পূর্বসুরী গুণী ব্যক্তিদের মূল্যায়ন করা তো দূরের কথা খোঁজ-খবরটুকুও রাখেন না। তাছাড়া বর্তমান প্রজন্মে এসে যতটুকু বা মূল্যায়ন করার চেষ্টা হচ্ছে, তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও খণ্ডিত। ঠুনকো স্বার্থের কারণে কাউকে বা অহেতুক বিরাট বিশাল করে দেখানো হচ্ছে আবার কাউকে কাউকে খাটো করতে করতে একেবারে মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে। কিন্তু বাস্তবে এর কোনটাই সত্য নয়। ফলে জাতি বিভ্রান্ত হচ্ছে, প্রকৃত গুণীরা ক্রমে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন।

সেই দায়ভার থেকেই আমরা **'মুসলিম মনীষীদের জীবনী'** ধারাবাহিকভাবে জাতির সামনে তুলে ধরার পদক্ষেপ নিয়েছি। প্রথম খণ্ডে দেশী-বিদেশী মোট ২০ জন মুসলিম মনীষীর সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল জীবনী তুলে ধরা হল। এদের মধ্য সাহিত্য, সাংবাদিকতা, ইসলাম প্রচার, রাজনীতি নানা অঙ্গনের মনীষীরা রয়েছেন। আমরা বয়োক্রম অনুযায়ী শিরোনাম সাজিয়েছি।

এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলো বিভিন্ন সময়ে জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাগুলোর ভেতর কয়েকটি লেখা কিশোর-তরুণদের উদ্দেশ্য করে লেখা। তবে আমাদের বিশ্বাস তথ্যবহুল ঐ লেখাগুলো বড়দেরও উপকারে আসবে।

'সেরা মুসলিম মনীষীদের জীবন কথা' প্রথম খণ্ডে যে লেখাগুলো স্থান পেল- তাতে যদি কারো চোখে কোন ভুল তথ্য ধরা পড়ে তা আমাদের লিখে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

বিনীত

নাসির হেলাল

১/জি/৯, মীরবাগ

ঢাকা ১২১৭

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১.	মহাকবি শেখ সাদী	৭
২.	মহাকবি হাফিজ শিরাজী	১৫
৩.	হযরত পীর আলী মুহাম্মদ তাহির (র.)	২১
৪.	মহাকবি আলাওল	২৯
৫.	শাহসূফী আবুবকর সিদ্দিকী (রহ.)	৩৩
৬.	শাহ মোহাম্মদ আবদুল করীম (রহ.)	৩৬
৭.	মহাকবি কায়কোবাদ	৪০
৮.	মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা	৪৪
৯.	মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ	৪৯
১০.	আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ	৫১
১১.	মহাকবি আল্লামা ইকবাল	৫৫
১২.	ইসমাইল হোসেন সিরাজী	৬২
১৩.	ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	৬৫
১৪.	শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন	৬৮
১৫.	কবি গোলাম মোস্তফা	৭৪
১৬.	বিদ্রোহী শাহজাদা	৮০
১৭.	পল্লীকবি জসীমউদ্দীন	৯২
১৮.	বন্দে আলী মিয়া	৯৬
১৯.	রাজপুত্তুর কবি	১০২
২০.	এক সংগ্রামী চেচেন নেতা জওহর দুদায়েভ	১০৭
●	গ্রন্থপঞ্জী	১১১

www.pathagar.com

মহাকবি শেখ সাদী

প্রকৃত নাম শরফুদ্দীন। ডাক নাম মসলেহ্উদ্দীন। আর উপাধি বা খেতাব হচ্ছে সাদী। আসল নাম নয়, ডাক নাম নয়, তিনি বিশ্বের মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে আছেন উপাধি 'সাদী' নামে। মানে শেখ সাদী নামে। জানা যায় কবির আব্বা তৎকালীন শিরাজের বাদশাহ্ আতাবক সাদ বেন জঙ্গীর সেক্রেটারী ছিলেন। কবি নিজে তুকলাবীন সাদ জঙ্গীর রাজত্বকালে কবিতা লিখতেন, এ কারণেই তিনি তাঁর নামের সংগে সাদী উপাধি যোগ করেন এবং পরবর্তীকালে শেখ সাদী নামেই পরিচিত হন।

শেখ সাদীর জন্ম সনের ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবুও মোটামুটি বলা যায় তিনি ৫৮০ হিজরী মোতাবেক ১১৮৪ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যু তারিখ সবার মতে ৬৯১ হিজরী মোতাবেক ১২৯২ খৃস্টাব্দ।

পরহেজগার পিতার সাহচর্যেই শেখ সাদী শিশুকাল অতিবাহিত করেন। পিতার দেখাদেখি সাদীও নামায, রোযা ও রাত্রিকালীন ইবাদতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। পিতার উৎসাহে কোরআন অধ্যয়নে তিনি যথেষ্ট সময় ব্যয় করতেন। বলা যায় দরবেশ পিতার আদর্শেই আদর্শবান হয়ে গড়ে ওঠেন শেখ সাদী।

বাল্যকালেই সাদীর পিতা ইন্তেকাল করেন। পিতার ইন্তেকালের পর সাদী পুণ্যবতী ও গুণবতী মায়ের তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠতে থাকেন। এ সময়ে তিনি একজন পন্ডিত ব্যক্তির স্নেহধন্য হন। তিনি হলেন তাঁরই শ্রদ্ধাভাজন মামা আল্লামা কুতুবুদ্দীন শিরাজী। যিনি কিনা হালাকু খাঁর প্রধানতম দরবারী বন্ধু ছিলেন।

তাঁর বাল্যকাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সূত্রে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। তবে তাঁর নিজের লেখা থেকে চমকপ্রদ কিছু ঘটনা জানা যায়। যেমন– তিনি যখন নিতান্ত ছোট তখন তাঁর আব্বা লেখার জন্য তাঁকে একটি 'তখতি' এবং হাতের আঙ্গুলে পরার জন্য একটি সোনার আংটি কিনে দেন। কিন্তু এক মিষ্টি বিক্রেতা কবিকে মিষ্টি দিয়ে ভুলিয়ে আংটি নিয়ে চম্পট দেয়। আংটি খোয়া গেলেও একথা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না যে কবি মিষ্টি খুব পছন্দ করতেন।

একবার ঈদের দিনে ঈদের ভিড়ে শেখ সাদী পিতার জামার প্রান্ত ধরে হাঁটছিলেন, যেন পিতা থেকে তিনি আলাদা হয়ে না যান। কিন্তু পথে খেলাধুলায় মত্ত ছেলেদের দেখে জামার প্রান্ত ছেড়ে তিনি তাদের দলে ভিড়ে যান। পরবর্তীতে

www.pathagar.com

শেখ সাদীর আব্বা যখন তাকে ফিরে পান রেগে গিয়ে তিনি (আব্বা) বলেন, 'গাধা! তোকে না বলেছিলাম কাপড় ছাড়িস না?'

জানা যায়, একবার তিনি তাঁর আব্বার সাথে সারারাত জেগে ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দেন। এ সময়ে ঘরের অন্যান্যরা ঘুমে অচেতন ছিল। এ অবস্থা দেখে সাদী তাঁর আব্বাকে বললেন,'দেখছেন, এসব লোক কেমন সংজ্ঞাহীন হয়ে ঘুমাচ্ছে। কারো এতটুকু সৌভাগ্যও হচ্ছে না যে, উঠে দু'রাকাত নামায পড়ে।' এ কথার উত্তরে সাদীর আব্বা বললেন, 'তুমি যদি শুয়ে থাকতে তবে ভালোই হতো; তাহলে পরচর্চা হতে বিরত থাকতে।'

শেখ সাদীর প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর মহান পিতার নিকট হয়েছিল। অল্প বয়সেই তিনি পিতৃহীন হন। এ সময়ে তিনি শিরাজের প্রখ্যাত আলেম-উলামাদের সংস্পর্শে আসেন এবং জ্ঞান আহরণ করেন।

প্রথম দিকে তিনি শিরাজের সুলতান গছদ্‌দৌলা প্রতিষ্ঠিত গছ্‌দিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। পরবর্তীতে তিনি স্থানীয় আরো কয়েকটি মাদ্রাসায় পাঠ গ্রহণ করেন। এ সময়ে দেশের শাসক আতাবক জঙ্গী দেশ জয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে দেশ গঠনে উদাসীন ছিলেন। ফলে দেশে অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছিল। যার জন্যে সেখানে শিক্ষার কোন পরিবেশ ছিল না বললেই চলে। এমতাবস্থায় শেখ সাদী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের মানসে বাগদাদ গমন করেন এবং সেখানকার বিখ্যাত মাদ্রাসা নিজামিয়ায় ভর্তি হন। এ নিজামিয়া মাদ্রাসার যাত্রাকাল থেকে মুতুওল্লী ছিলেন শিরাজের স্বনাম খ্যাত আলেম শেখ আবু ইসহাক শিরাজী। শেখ সাদী অল্পকালের মধ্যে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন এবং বৃত্তি লাভ করেন।

মাদ্রাসা নিজামিয়ায় অধ্যয়নকালে তিনি হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তৎকালীন সময়ের বিশ্ববিখ্যাত আলেম আল্লামা আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে জৌজীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ ব্যক্তি ছিলেন তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রে তখনকার ইমাম। ইবনে জৌজীর আরবী ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। শেখ সাদী আল্লামা শাহবুদ্দীন সুহরাবর্দীর সাহচর্য লাভ করেছিলেন।

শিশুকাল থেকে যদিও শেখ সাদী ফকিরী ও দরবেশী জীবন বেশি পছন্দ করতেন তবুও তিনি জ্ঞান অর্জনকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে বলেছেন, 'দরবেশ শুধু নিজকে বাঁচানোর চেষ্টায়ই থাকে। অপরপক্ষে আলেমদের চেষ্টা থাকে নিজের সাথে অন্য ডুবন্ত লোকদের বাঁচিয়ে তোলার।'

শেখ সাদী বাগদাদের লেখাপড়া শেষ করে দেশ ভ্রমণে বের হন। তিনি এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো দীর্ঘ সময় ব্যয় করে ভ্রমণ করেন। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনকে এভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন—

www.pathagar.com

ত্রিশ বছর লেখা পড়ায়
ত্রিশ বছর দেশ ভ্রমণে
ত্রিশ বছর গ্রন্থ রচনায়
ত্রিশ বছর আধ্যাত্মিক চিন্তায়।

শোনা যায় তাঁর জীবনের উক্ত চারটি পর্যায় যেদিন পূর্ণ হয় সেদিনই নাকি তিনি মৃত্যু বরণ করেন। শেখ সাদী দেশ ভ্রমণ করতে গিয়ে এমন পাণ্ডিত্য অর্জন করেন যে তিনি আঠারটি ভাষা রপ্ত করতে সক্ষম হন। এর ভেতর অনেকগুলি ভাষা তাঁর মাতৃভাষার মতই ছিল। আর তিনি এত অধিক দেশ ভ্রমণ করেন যে ইবনে বতুতা ছাড়া প্রাচ্য দেশীয় পর্যটকদের মধ্যে শেখ সাদীর মত কেউই বেশি দেশ ভ্রমণ করেন নি। শুনলে আশ্চর্যান্বিত হতে হয় যে, তিনি পায়ে হেঁটে চৌদ্দবার হজ্জ পালন করেছিলেন। তিনি তার সফরকালে অসংখ্য নদী এমনকি পারস্যোপসাগর, ভারত মহাসাগর, ওমান সাগর, আরব সাগর প্রভৃতি পাড়ি জমিয়েছেন। আর সঞ্চয় করেছেন জ্ঞানের রাজ্যে অসংখ্য মনি-মুক্তা, হিরা-জহরত।

দেশ ভ্রমণকালে শেখ সাদী এক সময় কোন কারণে দামেশকবাসীর প্রতি বিরাগভাজন হয়ে ফিলিস্তিনের জঙ্গলে আশ্রয় নেন। কিন্তু এ সময়ে তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে তথাকার খৃস্টানদের হাতে বন্দী হন। খৃস্টানগণ বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরী থেকে আনীত ইহুদী বন্দীদের সাথে কবিকে খন্দক খননের কাজে নিয়োগ করে। বহুদিন এভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর সৌভাগ্যক্রমে তাঁর পিতার এক বন্ধু তাঁকে এ অবস্থায় দেখতে পান এবং কুশল বিনিময় করেন। উত্তরে শেখ সাদী বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের সঙ্গ পরিহার করে ফিরছিল সে যদি পশুর মধ্যে বন্দী হয় তবে তার কি অবস্থা?' অবস্থা বুঝে পিতার ঐ বন্ধু দশ দিনার মুক্তিপণ দিয়ে তাঁকে মুক্ত করে আনেন এবং একশত আশরাফী দেনমোহর ধার্য করে তার সাথে নিজের কন্যার বিয়ে দেন। কিন্তু সাদীর নববিবাহিতা পত্নী অত্যন্ত বাচাল ছিলেন, যার ফলে এ বিয়ে বেশিদিন টিকেনি। তিনি একদিন সাদীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'তুমি কি পূর্ব জীবনের কথা ভুলে গেছ, তুমিতো সেই ব্যক্তি যাকে আমার পিতা দশটি রৌপ্য দিনার দিয়ে মুক্ত করেছিলেন?' কবি উত্তরে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ তিনি দশ দিনারে মুক্ত করে একশত আশরাফী দিয়ে পুনরায় বন্দী করেছেন।'

ভারত ভ্রমণকালের একটা ঘটনা তাঁর বুসতাঁ কাব্যগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হল– সোমনাথ মন্দিরের। কবির মুখেই শুনি সে ঘটনা, "আমি সোমনাথ এসে যখন দেখতে পেলাম হাজার হাজার লোক এসে মূর্তির নিকট নিজ নিজ মনস্কামনা হাসিলের জন্য পূজা দিচ্ছে তখন আমি বিস্মিত হলাম। হাজার হাজার জীবিত লোক-এক প্রাণহীন মূর্তির নিকট মনস্কামনা সিদ্ধির প্রার্থনা জানাচ্ছে।"

একদিন আমি এক ব্রাহ্মণের নিকট যেয়ে এর রহস্য জানতে চাইলাম।

ব্রাহ্মণ আমার কথা শুনে মন্দিরের পূজারীদের ডেকে আনলো– তারা এসে ক্রোধ ভরে আমাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলল, আমি তখন সমূহ বিপদ দেখে বললামঃ তোমাদের দেবতার আপমান করা আমার উদ্দেশ্য নয়..... তবে আমি এখানে নতুন এসেছি, এ মহান দেবতার পূজাদি কিভাবে দিতে হবে জানি না বলে তা জানতে চেয়েছি। আমাকে তা শিখিয়ে দাও যেন ঠিক পূজা করতে পারি।

তখন পূজারিগণ খুশি হয়ে আমাকে পূজার ধরন ধারণ শিখিয়ে দিয়ে মন্দিরে নিয়ে গেল। তারা আরও বলল, আজ রাতে তুমি মন্দিরে থাক তখন এ দেবতার শক্তি দেখতে পাবে।

আমি সারারাত মন্দিরে কাটালাম। ভোর হওয়ার কিছু পূর্বে অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষ মন্দিরে ঢুকে পড়ল। তখন মূর্তি একখানা হাত উঠিয়ে পূজারীদের আশীর্বাদ করল। তখন সকলেই জয় জয় করে উঠল। এরপর নিশ্চিন্ত মনে সকলে চলে গেল। ঐ ব্রাহ্মণ আমাকে হেসে বলল, কি বল, এখন তো বিশ্বাস হলো!

আমি বাহ্যিকভাবে কেঁদে কেঁদে আপন মূর্খতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলাম।

তখন ব্রাহ্মণগণ আমার প্রতি সদয় হয়ে মূর্তির নিকট নিয়ে গেলে আমি তার হাত চুম্বন করে সম্মান জানালাম।

এরপর যেন সত্যিকার ব্রাহ্মণ হয়ে আমি নিশ্চিন্তে মন্দিরে আসা-যাওয়া করতে লাগলাম।

আর এক রাত্রে সকলে চলে গেলে; আমি মন্দিরের দরোজা বন্ধ করে মূর্তির নিকট গিয়ে এর ভেদ জানতে চাইলাম। আমার চোখে পড়ল মূর্তির পিছনে একখানি পরদার আড়ালে একটি রশি ধরে একজন পূজারী বসা আছে। রশির একদিক মূর্তির সাথে বাঁধা। সে পূজারী যখন রশি ধরে টানে তখনই মূর্তির হাত উপরে উঠে যায় আর সাধারণ লোক তাকেই মূর্তির শক্তি মনে করে নাচতে থাকে।

সে পূজারী পর্দার আড়াল থেকে যখন দেখতে পেল আমি তাদের গোপন রহস্য জেনে ফেলেছি তখন সে দৌড়ে পালিয়ে যেতে লাগল। আমি তখন প্রাণের ভয়ে তাকে ধরে এক কূপে ফেলে দিলাম।

এরপর সে রাতেই সোমনাথ ছাড়লাম। ভারতের পথে ইমনের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে হেযাজে এসে পৌছলাম।"

শেখ সাদী হলেন বিশ্ববিখ্যাত ক'জন কবির মধ্যে অন্যতম। তাঁর রচিত গুলিস্তাঁ ও বুসতাঁ বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। অনেকে মনে করেন এ দু'টি গ্রন্থ অধ্যয়ন ব্যতীত ফারসী সাহিত্য অধ্যয়ন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এ গ্রন্থ দু'টি একত্রে 'সা'দী

www.pathagar.com

নামাহ’ নামে পরিচিত। নৈতিকতা বিষয়ক কাব্যগ্রন্থ হল বুসতাঁ। আর নৈতিকতা বিষয়ক গদ্যগ্রন্থ হল গুলিস্তাঁ। গুলিস্তাঁয় লেখক অত্যন্ত সহজ-সরল হৃদয়গ্রাহী ভাষায় নৈতিকতার বিষয় আশয় গল্পোচ্ছলে পরিবেশন করেছেন। এর ভেতর অবশ্য কবিতাও আছে। এমন কি কোরআন হাদীসের উদ্ধৃতিও লেখক ব্যবহার করছেন নিজের বক্তব্যকে সুন্দর ও জোরাল করার জন্য।

সাদী ছিলেন অসাধারণ কাব্য প্রতিভার অধিকারী। এ ব্যাপারে মাওলানা আবদুর রহমান জামী বলেছেন, ‘রুমীর মস্‌নবী, আনোয়ারীর কাসিদা এবং সাদীর গযল সমপর্যায়ের।’

তিনি আরো মনে করতেন যে, শেখ সাদী বিশ্ব বিখ্যাত লেখক আমীর খসরুর চেয়েও বড় লেখক।

এমনকি জামী শেখ সাদী সম্পর্কে এ কথাও বলেছেন, ‘আমীর খসরু একবার হযরত খিযিরের নিকট গিয়ে কাব্য লেখার শক্তি চেয়েছিলেন। তখন খিযির বলেছিলেন, তা শেখ সাদীকে দেয়া হয়েছে।’

অবশ্য আমীর খসরু নিজেও তার ‘সেপাহর মস্‌নবী’ গ্রন্থে শেখ সাদীকে গযলের উস্তাদ হিসেবে স্বীকার করেছেন।

শেখ সাদীর কাব্য প্রতিভা সম্বন্ধে চমৎকার একটা গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি হল– ‘শিরাজের এক ব্যক্তি সাদীর কাব্য প্রতিভা সম্বন্ধে সন্ধিহান ছিল। এক রাতে ঐ ব্যক্তি স্বপ্নে দেখতে পেলেন, একজন ফেরেশতা একখানি নূরের বরতন নিয়ে মাটিতে নেমে এসেছেন।

ঐ ব্যক্তি জানতে চাইলেন একি ব্যাপার ? ফেরেশতা জবাবে বললেন, সাদীর একটি কবিতা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে- সে জন্য এ বেহেশতের উপহার। কবিতাটি হল—

জ্ঞানিদের চোখে
গাছের ঐ সবুজ পাতা
খোদা তত্ত্বের
এক একখানি গ্রন্থ।

ঐ ব্যক্তির যখন ঘুম ভেঙে গেল তখন সেই রাতেই তিনি সাদীর গযলটির ব্যাপারে সপ্নে দেখা খোশ্ খবর জানাতে গেলেন। আশ্চর্য! লোকটি দেখেন উজ্জ্বল বাতি জ্বেলে শেখ সাদী সে কবিতাটিই পড়ছেন।’

আরো একটি ঘটনা, শেখ সাদী তখন দেশ-বিদেশে বেশ মশহুর হয়ে পড়েছেন। একদিন শিরাজ থেকে ষোল শ’ মাইল দূরের কাশগড়ে বেড়াতে

www.pathagar.com

গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন ছোট বড় সবাই তার নাম জানে ও তাঁর কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ।

সাদী উঠেছিলেন কাশগড়ের জামে সমজিদে। সেখানে একজন ছাত্র আল্লামা যমখ্শরীর একটা গ্রন্থ্ হাতে নিয়ে বলছিল, 'কোরবে যায়েদ মির'।

ছাত্রটির কথা শুনে শেখ সাদী বললেন, 'খাওয়ারযমের ও তাঁর শত্রুর মাঝে সন্ধি হয়ে গেছে তবে যায়েদ ও মিরের ঝগড়া এখনো চলছে।'

ছাত্রটি এ কথা শুনে সাদীকে উদ্দেশ্য করে বলল, জনাবের বাড়ি ?

শিরাজ।

তবে তো সাদীকে চেনেন। তাঁর দু'একটি কালাম শোনাবেন কি ?

আরবীতে কিছু কালাম বললেন সাদী।

যদি দু'একটি ফারসী কালাম শোনাতেন। ছাত্রটি বলল।

একটি ফারাসী বয়াত পেশ করলেন সাদী।

পরে যখন ছাত্রটি জানলো 'ইনিই সেই মহাকবি শেখ সাদী। তখন সে করজোড়ে কবির কাছে ক্ষমা চেয়ে বলল, কাশগড়ে যদি কিছুকাল অবস্থান করেন তো খেদমত করতে পারতাম।'

কিন্তু সাদী কাশগড়ে আর থাকতে পারেন নি। তিনি সেখান থেকে তিবরিজ চলে যান।

অনেক ইংরেজ কবি লেখক শেখ সাদীকে প্রাচ্যের শেকস্পীয়র নামে আখ্যায়িত করেছেন।

শেখ সাদীর বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হল—

১. গুলিস্তাঁ	২. বুস্তাঁ
৩. করিমা	৪. সাহাবিয়া
৫. কাসায়েদে ফারসী	৬. কাসায়েদে আরবীয়া
৭. গযলিয়াত	৮. কুল্লিয়াত ইত্যাদি।

বুস্তাঁ ও গুলিস্তাঁ গ্রন্থ্ দু'টি এশিয়ায় সব থেকে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এই গ্রন্থ্ দু'টির অনেক কথায় পারশ্য সাহিত্যে প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

পণ্ডিতদের মতে গদ্য ও পদ্য সব মিলায়ে ফারসী ভাষায় ৪ খানি গ্রন্থ্ শ্রেষ্ঠ, তা হল—

মহাকবি ফেরদাউসী'র	—	শাহনামা
জালালুদ্দীন রুমি'র	—	মসনবী
শামসুদ্দীন হাফেযে'র	—	দিওয়ান
এবং শেখ সাদীর	—	গুলিস্তাঁ

www.pathagar.com

গুলিস্তাঁ উপদেশমূলক চমৎকার চমৎকার গল্পে ভরপুর। যেমন– 'এক বাদশাহ এক অপরাধীকে মৃত্যুদন্ড দেন। লোকটি বহু কাকুতি-মিনতি করেও যখন কিছু হল না তখন বাদশাহকে গালি দিয়ে বসল।

বাদশাহ তার কথা বুঝতে না পেরে উযীরের নিকট জানতে চাইলেন সে কি বলেছে।

সে উযীর ছিলেন নেক মেযাজের, তাই তিনি লোকটির উপকারার্থে বললেনঃ হুযুর, লোকটি বলছে— যিনি রাগ দমন করে অপরাধ করেন, তিনি খোদার বন্ধু। একথা শুনে বাদশাহ খুশি হয়ে লোকটিকে ছেড়ে দেয়ার আদেশ দিলেন। অন্য একজন উযীর ছিলেন হিংসুক। তিনি বাধা দিয়ে বললেন, হুযুর, এ মিথ্যা কথা। এ লোকটি আপনাকে মন্দ বলেছে।

তা শুনে বাদশাহ বললেন, তোমার কথা সত্য হলেও অন্য উযীরের মিথ্যার চেয়ে নিকৃষ্ট। কারণ তাতে ছিল পরোপকারের উদ্দেশ্য— আর তোমার কথায় অনিষ্টের অভিসন্ধি।'

বাদশাহ লোকটিকে ক্ষমাই করেছিলেন।

এমনি সব গল্প দিয়ে ভরা রয়েছে গুলিস্তাঁ। যাঁর তুলনা বিশ্ব সাহিত্যে দ্বিতীয়টি নেই।

শেখ সাদী দৈহিকভাবে অত্যন্ত বলিষ্ট মানুষ ছিলেন। কষ্টসহিষ্ণু এ মানুষটি প্রচণ্ড উদারও ছিলেন। তিনি পায়ে হেঁটে দেশের পর দেশ সফর করেছেন। পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি নদী-নালা সবকিছুই তাঁর পায়ের তলায় হার মেনেছে। এমনকি তিনি ফকির-দরবেশদের মত এসব পথ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খালি পায়ে পাড়ি জমিয়েছেন।

এ ধরনের ভ্রমণে যে নানা ধরনের দুঃখ-কষ্ট আসে তা ভুক্তভুগীরা জানেন। শেখ সাদীর জীবনেও নানা বিপদ-আপদ এসেছে এবং তিনি তা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু একবার তিনি নিজেকে ধরে রাখতে পারেন নি। এ ব্যাপারে গুলিস্তাঁ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 'আমি কখনও কালের কঠোরতা এবং আকাশের নির্মমতার অভিযোগ করিনি। তবে একবার আমি আর ধৈর্য রাখতে পারিনি। আমার পায়ে জুতা ছিলনা, জুতা কেনার অর্থও ছিল না। তখন দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে কূফার সমজিদে গিয়ে উঠলাম। তথায় গিয়ে দেখি একটি লোক শুয়ে রয়েছে যার একখানি পা-ই নেই। তখন খোদাকে শোকর জানিয়ে নিজের খালি পা থাকাও গণিমত মনে করলাম।'

শেখ সাদী তাঁর দীর্ঘ জীবনে অসংখ্য বিচিত্র সব ঘটনা দেখেছেন। তিনি দেখেছেন– বিভিন্ন রাজ বংশের উত্থান-পতন। তিনি উযীরের ছেলেকে ভিক্ষা

www.pathagar.com

করতে দেখেছেন। আবার ভিক্ষুককে দেখেছেন উযীর বনে যেতে। তিনি এও দেখেছেন মুসলিম সম্রাটের শৌর্য-বীর্য, সাথে সাথে পতনের দৃশ্য। তাঁরই সামনে তাতারদের হাতে সাত লক্ষ মুসলমান খুন হয়েছে, খোরাসানের চারটি শহর, বলখ, মরদ, হেরাত এবং নিশাপুর ধ্বংস হতে দেখেছেন।

শেখ সাদী বড় বড় দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছেন। এ সময়ে তিনি দেখেছেন ক্ষুধার তাড়নায় কিভাবে মানুষ মারা যায়।

এ সমস্ত অভিজ্ঞতা সাদীর লেখনিকে ক্ষুরধার করেছে, অলংকৃত করেছে। তিনি নিজেই আরবী একটি মর্সিয়ায় বলেছেন—

আব্বাসীয় খেলাফতের ধ্বংসের পর
যে সমাধান হয়েছে
খোদা তার সহায় হোক।
কেননা
যায়েদের বিপদ
উমরের চোখ খুলবে।

এই মহান মনীষী কবিকুল শিরোমণি শেখ সাদী ৬৯১ হিজরী মোতাবেক ১২৯২ খৃষ্টাব্দে আতাবকানের বংশের রাজত্বের শেষ সময়ে শিরাজ নগরীতে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল একশত কুড়ি বছর।

শিরাজ নগরীর দিলকুশার এক মাইল পূর্ববর্তী পাহাড়ের পাদদেশে কবিকে সমাধিস্থ করা হয়। ◎

www.pathagar.com

মহাকবি হাফিজ শিরাজী

"হে হাফিজ তোমার বাণী চিরন্তনের মত মহান। কেননা, তার জন্যে আদি ও অন্ত নেই। তোমার ভাষা আসমানের গম্বুজের মতো একাকী নিজের ওপরই স্থিত। তোমার গজলের অর্ধেকটায় বা প্রথম কলিতে কিংবা অন্য কোন অংশের মধ্যে মোটেও পার্থক্য করা যায় না। কেননা, এর সবটাই সৌন্দর্য ও পূর্ণতার নিদর্শন। একদিন যদি পৃথিবীর আয়ু ফুরিয়ে যায়, হে আসমানী হাফিজ! আমার প্রত্যাশা যে, একমাত্র তোমার সাথে ও তোমার পাশে থাকবো। তোমার সঙ্গে শরাব পান করব। তোমার মতোই প্রেমে আত্মহারা হবো। কেননা এটাই আমার জীবনের গৌরব ও বেঁচে থাকার পাথেয়।" (ওয়ালফ গঙ্গ গ্যেটে)

যাঁর সম্বন্ধে মহাকবি গ্যেটে এ কথা বলেছেন তিনি হলেন বিশ্বের কবি কুল শিরোমনি হাফিজ শিরাজি। তাঁর পুরো নাম হল খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফিজ শিরাজী। বিশ্বের বিরল কবি ব্যক্তিত্ব হাফিজ শিরাজী ৭১০ থেকে ৭৩০ হিজরী সনের মধ্যে ইরানের শিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বাহাউদ্দীন সুলগারী। কবি শিরাজী ছিলেন পিতা সুলগারীর কনিষ্ঠ পুত্র। কবির দাদা ছিলেন ইরানের ইস্পাহান প্রদেশের 'কুপাই' নামক স্থানের অধিবাসী। আতাবক শাসন আমলে তিনি সপরিবারে কুপাই ত্যাগ করে ফারছ-এর রাজধানী শিরাজ নগরীর রুকনাবাদ নামক মহল্লায় বসবাস শুরু করেন। কবির মায়ের জন্মস্থান ছিল 'কাজেরুণ' নামক স্থানে।

হাফিজ শিরাজী অত্যন্ত অল্প বয়সে পিতৃহারা হন। যে কারণে পাঠশালায় গমনের পরিবর্তে রুটি রুজির তাগিদে তিনি একটি রুটির দোকানে কাজ নেন। এখানে তাঁকে শেষ রাত পর্যন্ত কঠোর শ্রম দিতে হত। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের বাংলার বুলবুল কবি কাজী নজরুলের জীবনের সাথে একান্ত মিল দেখতে পাই। কাজী নজরুল ইসলামও শিশুকালে ইয়াতিম হন এবং জীবিকার জন্য রুটির দোকানে কাজ নেন। কবি শিরাজী যে পথ দিয়ে রুটির দোকানে যেতেন ঐ পথেই ছিল একটি মক্তব। আসা-যাওয়ার পথে তাঁর মনে কোরআন শিখবার ইচ্ছে জাগে। তিনি মক্তবে ভর্তি হন এবং রুটির দোকানে কাজের পাশাপাশি লেখাপড়ার কাজও চালিয়ে নিতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যেই শিরাজী সমগ্র কোরআন কণ্ঠস্থ করেন ও লেখাপড়ায় অশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তোমরা শুনলে বিস্মিত হবে যে, তিনি

www.pathagar.com

চৌদ্দটি পদ্ধতিতে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে পারতেন। তিনি এ সম্বন্ধে বলেছেন,

'যে হাফেজানে জাহান ছুবন্দে জাম না কারদ
লতায়েফে হুকমী বা নেকাতে কোরআনী।'

অর্থাৎ—

'জগতের মাঝে এমন হাফেজ পাবে নাকো খুঁজে,
আমার মত যে কোরআনের তত্ত্বে দর্শন বুঝে।'

জানা যায় তিনি রুটির দোকানে কাজ করে যে রোজগার করতেন তা চার ভাগে ভাগ করে নিয়ে একভাগ তাঁর মায়ের জন্য দ্বিতীয় ভাগ শিক্ষকদের জন্য, তৃতীয়ভাগ ফকির মিসকীনদের জন্য এবং চতুর্থভাগ রাখতেন নিজের হাত খরচের জন্য। কবির দিওয়ানে-ই-হাফিজসহ অন্যান্য গ্রন্থ থেকে জানা যায় তিনি তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। তিনি ইসলামী আইন শাস্ত্র (ফিক্‌হ), হাদীস, ন্যায়শাস্ত্র (কালাম), তাফসীর, ফার্সী সাহিত্য ইত্যাদিতে সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। এমনকি তিনি জ্যোতিষ বিজ্ঞানের জ্ঞানও আয়ত্ত্ব করেছিলেন।

কবি শিরাজী তাঁর যৌবনকালেই লেখালেখিতে হাত পাকিয়েছিলেন বলে জানা যায়। যতদূর সম্ভব তিনি শাহ শেখ আবু ইছহাক ইনজুর রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। হাফিজের কবিতায় আবু ইছহাকের প্রশংসা কীর্তন আছে। অবশ্য তাঁর জীবদ্দশাই তিনি মুজাফফর বংশীয়দের শাসনকালও অবলোকন করেন। যাই হোক কবি তাঁর জীবদ্দশাতেই খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি অর্জনে সক্ষম হন। যদিও তাঁর সময়টা ছিল সাহিত্য ও কাব্যচর্চার জন্য খুবই খারাপ সময়। কারণ এ সময়টাতে তাঁর দেশে নানা রকম হানাহানি, যুদ্ধ বিগ্রহ বিরাজমান ছিল।

কবি খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ভক্তবৃন্দ তাঁকে নিজেদের মধ্যে পাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে থাকে। বাগদাদের সর্বগুনান্বিত সুলতান আহমদ বিন আবেস কবি হাফিজকে বাগদাদে পাওয়ার জন্য বারবার আমন্ত্রণ পাঠাতে থাকেন কিন্তু কবি প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে ঐ সময় কোথাও যেতে রাযি ছিলেন না। তাই সম্রাটের আহবানকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

ইস্পাহানের শাসনকর্তার মন্ত্রী উম্মাদ বিন-মাহমুদ কবিকে দাওয়াত করেছিলেন। কিন্তু কবি এ দাওয়াতও কবুল করেন নি।

দাক্ষিণাত্যের বাহমনী সুলতান শাহ মাহমুদ কবি সাহিত্যিকদের অসম্ভব সম্মান করতেন। দেশ বিদেশের কবি সাহিত্যিকদের তিনি নানা সম্মানে সম্মানিত করতেন। এ সময়ে কবি হাফিজ দাক্ষিণাত্যে আসার জন্য ইরাদা করেছিলেন কিন্তু নানা কারণে তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

www.pathagar.com

বাঙালীদের জন্য গর্বের বিষয় হল, সে সময়কার বাংলার শাসনকর্তা গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ্ কবি শিরাজীকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কবি না আসতে পারলেও সে কথা তার কবিতায় লিখে গেছেন। কথিত আছে সুলতান গিয়াস উদ্দিনের তিনজন প্রিয় দাসী ছিলেন, এদের নাম সরব, গুল ও লালা।

সুলতান একদিন এ চরণটি ফাঁদলেন—

'সাকী হাদীসে সারবো গোলো লালা মিরওয়াদ' কিন্তু আর পরবর্তী লাইন পূরণ করতে পারলেন না। সভাকবিরাও সুলতানের মনপুত কিছু দিতে পারলেন না। তখন সুলতান উক্ত লইনটি কবি হাফিজ শিরাজীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কবি হাফিজ শিরাজী এর উত্তরে কবিতাটি পূর্ণ করে সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কবিতাটি এ রকম—

সাকী হাদীসে সারবো গোলো লালা মিরওয়াদ।
ওইন বাহাস বা সালাসায় গোসালা মিরওয়াদ।

....

....

হাফিজ যে শওকে মজলেসে সোলতান গিয়াছোদ্দিন।
খামুশ মালো কে কারে তু আজ লালা মিরওয়াদ।।

কবিতাটির শেষ দু'লাইনের অর্থ হল- 'হে হাফিজ সুলতান গিয়াসউদ্দিনের মজলিসে চুপ করে থেকো না, কেননা তোমার কাজ কান্নার মধ্য দিয়ে সুসম্পন্ন হয়েছে।'

কবি শিরাজী সুলতান গিয়াস উদ্দীনের আমন্ত্রণ পাওয়ার পর বাংলায় আসার জন্য মনস্থির করেছিলেন বলে জানা যায়, কিন্তু সাইক্লোন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আসতে পারেন নি। আমাদের গর্ব হল কবিকে আমন্ত্রণ জানানোর কারণে বাংলা ও বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ্ ইরানের সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন।

কবি হাফিজ শিরাজী কাব্য প্রতিভা ও দর্শন সারা পৃথিবীর কাব্যা মোদী ও চিন্তাশীল মনকে যুগে যুগে নাড়া দিয়ে আসছে। পাশ্চাত্য দুনিয়ার মহান কবি ও চিন্তাবিদ গ্যেটে (১৭৩৯-১৮৩২) বলেন, 'হঠাৎ প্রাচ্যের আসমানী খুশবু এবং ইরানের পথ-প্রান্তর থেকে প্রবাহিত চিরন্তন প্রাণ সঞ্জীবনী সমীরণের সাথে পরিচিত হলাম। আমি এমন এক অলৌকিক ব্যক্তিকে চিনতে পেলাম, যাঁর বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব আমাকে আপাদমস্তক তার জন্য পাগল করেছে।' মহাকবি গ্যেটে

www.pathagar.com

হাফিজের প্রতি এতই অনুরক্ত হয়ে পড়েন যে, 'একটি সময়ের জন্য সবাইকে এবং সবকিছুকে ভুলে যান এবং নিজেকে ফার্সী ভাষার এই কবির ক্ষুদ্র ভক্ত বলে অনুভব করেন।' এমন কি তিনি হাফিজের প্রেমানুভূতি ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকাব্য ফাউস্ট (Faust) রচনা করেন। যেটাকে পাশ্চত্য দিওয়ান বলা হয়।

বাংলা ভাষাভাষী কবি-সাহিত্যিকদেরকেও তিনি দারুণভাবে নাড়া দিয়েছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো নিজে ১৯৩২ সালে ইরানের শিরাজ নগরে কবির মাজারে উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধা নিবদেন করে এসেছেন। এমনকি কবির পিতা মহর্ষি দেবন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির অসম্ভব ভক্ত ছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে এ ব্যাপারে লিখেছেন, 'আমি জানি যে, হাফিজের ধর্মীয় দর্শন ও কবিতা আমার পিতার হৃদয়কে যতখানি অভিভূত করত, বৈষ্ণবদের দর্শন ও সঙ্গীত ততখানি করতে পারত না। হাফিজ ছিলেন তাঁর ঐশ্বরিক আনন্দ। তিনি নিজে কবিতা লিখতেন না। হাফিজের কবিতাই তাঁর সৃষ্টির আকাংঙ্ক্ষাকে পূরণ করতো। উপনিষদ তার ক্ষুধা নিবৃত্ত করত এবং হাফিজ তাঁর তৃষ্ণা মিটাতো।'

জানা যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুরো দিওয়ান কণ্ঠস্থ ছিল।

গিরিশচন্দ্র সেন, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, হরেন্দ্র দেব প্রমুখ বিখ্যাত কবিরা কবি হাফিজের বহু রুবাইয়াৎ ও গজলের অনুবাদ করেছেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম হাফিজকে এত প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন যে, পুত্র বুলবুলের মৃত্যু শয্যায় বসেও তাঁর রুবাইয়াৎ অনুবাদ করেছেন। তিনি ফার্সী থেকে মোট ৭৩টি রুবাই সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করেন। তিনি যেদিন অনুবাদ শেষ করেন সেদিন কবি পুত্র বুলবুল ইন্তেকাল করেন। কবি তাই বেদনার সাথে লিখেছেন, 'আমি আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান ও সবচেয়ে প্রিয় সম্পদকে উপঢৌকন দিয়ে শিরাজের বুলবুল কবিকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। ইরানের কবি সম্রাট হাফিজ বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দীনের আমন্ত্রণে সাড়া দেননি। কিন্তু তিনি আমার আমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে পারতেন না।'

ফার্সী সাহিত্যের ব্যাপক আলোচনা করে লেখা গ্রন্থটি হচ্ছে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর 'পারস্য প্রতিভা'। এ গ্রন্থে কবি হাফিজের ওপর একটি চমৎকার প্রবন্ধ আছে। মুহাম্মদ মুনসুর উদ্দীন লিখেছেন, 'ইরানের কবি'। অবশ্য এ গ্রন্থে 'সামসুদ্দীন হাফিজ' নামে যে নিবন্ধটি আছে তা তেমন তথ্যবহুল নয়।

বাংলা ভাষায় দিওয়ানে হাফিজের বহু অনুবাদ হয়েছে। এরমধ্যে ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর অনুবাদ কর্মটি বাংলা ভাষার এক অসামান্য প্রকাশনা। এ বইয়ের দীর্ঘ

www.pathagar.com

উপক্রমনিকাতে তিনি হাফিজকে বাংলা ভাষাভাষির কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে কাজী আকরাম হোসেনের অনুবাদটিও চমৎকার।

সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার দু'জন আধুনিক কবি যাঁরা প্রগতিবাদী হিসেবেও পরিচিত, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুবাশ মুখোপাধ্যায় কবি হাফিজের সাহিত্যকর্ম অনুবাদ করেছেন।

কবির ৬০০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় আয়োজিত এক সম্মেলনে জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বলেন, 'কবি হাফিজ আমাদের চিন্তায় ও মননে বহুকাল বিদ্যমান ছিলেন। বাংলা কবিতায় আবার তিনি নতুন করে জাগ্রত হচ্ছেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের বাঙ্গালী মনীষায় হাফিজ ছিলেন অনেক বড় প্রতিভা, অনেক বড় কবি এবং প্রেমিক। কবির কোরআনের ওপর দক্ষতা দেখে সমকালীন একজন পীর-মুর্শিদ তাঁকে 'হাফিজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। এ ব্যাপারে কবি নিজেই লিখেছেন—

'হাফিজ! তোমার চেয়ে সুন্দর গান দেখি নাই আর কারো
তোমার মুখের লুকানো কোরান সে তো সুন্দর আরো।'

কবি ছিলেন একজন সুন্দর প্রেমিক। তিনি তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে লিখেছেন—

'প্রেয়সী মোর ছিল যে হায় পরীর মতো অপসরী
পা থেকে তার কেশাগ্রতক নিটোল যেন ঠিক পরী।'

কবি তাঁর আদরের সন্তানের মৃত্যুতে শোকাতুর হয়ে লিখেছেন—

'মোর নয়ন মণি দীলের মেওয়া তাহার তরে কাঁদে প্রাণ
হাসতে হাসতে গেল চলে, শোকে আমি মূহ্যমান।'

যদিও এখানে আপন সন্তানের জন্য কবি হাফিজ এ আর্তি ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু এ শোক বাণী জগতের সব পুত্রহারা পিতৃ হৃদয়েকে নাড়া না দিয়ে পারে না।

ও যাহ্! একটা কথা বলতে ভুলেই গেছি। দিগ্বিজয়ী মঙ্গল বীর তৈমুর লং কবির একটা কবিতা না বুঝতে পেরে কবিকে তলব করেন। কবিতাটি ছিল—

সেই শিরাজী প্রেমিক যদি জয় করে মোর এই হিয়ারে
তার গালের তিলে বিলিয়ে দেব সমরকন্দ আর বুখারারে।

(দিওয়ানে হাফিজ-গজল নং-৩)

তৈমুর লং কবির কাছে জানতে চাইলেন, এ কবিতা কার? কবি যখন স্বীকার করলেন এ তারই কবিতা, তখন তৈমুর লং বললেন, 'আমি হাজার হাজার সৈন্যের রক্তের বিনিময়ে হাজারো ত্যাগের বিনিময়ে যা দখল করেছি, হাজারো লক্ষ ধন-

www.pathagar.com

সম্পদ রত্নরাজির বিনিময়ে যা গড়ে তুলেছি, আর তুমি নারীর গালের কালো তিলের বিনিময়ে তা বিলিয়ে দিতে চাচ্ছ?

কবি বুঝলেন, যুদ্ধবাজ তৈমুরের মাথায় কাব্যের মহিমা ঢোকার কথা নয়। কবি তাই বিনীতভাবে বললেন, 'মহামান্য বাদশাহ্। এভাবে দান-খয়রাত করতে গিয়েই তো আমার আজ এ দীন হীন অবস্থা। আপনি আমার মতো করেন নি বলেই তো আপনি আজ জগদ্বিখ্যাত সম্রাট।'

কবি হাফিজের উপস্থিত চমৎকার উত্তরে তৈমুর লং খুশি হলেন। তিনি কবিকে সোনার আশরাফী উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করলেন।

বিশ্বখ্যাত এই মহান কবি খাজা সমাসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফিজ শিরাজী ৭৯১ হিজরী সালে শিরাজ নগরে ইন্তেকাল করেন। কবির মাজার শিরাজ নগরেই অবস্থিত। এখন এলাকাটি 'হাফেজিয়া' নামে প্রসিদ্ধ। ◎

www.pathagar.com

হযরত পীর আলী মুহাম্মদ তাহির (র.)

ভারত উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে যে সমস্ত অলিয়ে কামিল ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেছেন এবং ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে হযরত উলূঘ খান জাহান (র.) নিঃসন্দেহে অন্যতম। এ মহান মনীষির সাথে যে সমস্ত শিষ্যগণ ছিলেন তারাও স্ব স্ব মহিমায় খ্যাতিমান হয়ে আছেন। কিন্তু এই বাংলার সন্তান একেবারে খাস বাঙালী কোন শিষ্য, হযরত পরীর আলী মুহাম্মদ তাহির (র.)-এর মত যশস্বী হতে পারেননি।

আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দির গোড়ার দিকে হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে মুহাম্মদ তাহির জন্মগ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে নীলকান্ত বলেছেন–

'পীর আলী নাম ধরে পীরাল্যা গ্রামে বাস
যে গাঁয়েতে নবদ্বীপের হইলো সর্বনাস।'

তাঁর পূর্ব নাম ছিল, 'গোবিন্দ ঠাকুর'। অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র মিত্র তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁকে খাটো চোখে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি লিখিছেন, 'তাঁহার পূর্বে কি নাম ছিল, জানি না, জানিয়াও কোন কাজ নাই, এখন তাঁহার নাম হলো মোহাম্মদ তাহের।'[১] অবশ্য এ, এফ. এম. আবদুল জলিল সাহেব সাহেব এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'বহুদিন অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিয়াছি যে, এই ব্রাহ্মণ সন্তানের পূর্ব নাম ছিলো গোবিন্দলাল রায়। তিনি গোবিন্দ ঠাকুর নামেই পরিচিতি ছিলেন। ইনি খান জাহানের বিশেষ প্রিয় পাত্র ও আমত্য ছিলেন।'[২] তিনি হযরত উলুঘ খান জাহান আলী (র.)-এর পরশে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং প্রধান সহচরে পরিণত হন। হযরত উলূঘ খান জাহান আলী (র.)-এর এ দেশীয় শিষ্যদের মধ্যে হযরত পরী আলী মুহাম্মদ তাহিরই সব থেকে বেশি প্রসিদ্ধ ও জননন্দিত ছিলেন। তাঁর হাতে হাজার হাজার অমুসলিম ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন। এই নবদীক্ষিত মুসলমানরা পীরেলি নামে পরিচিত হন।

পীরেলি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে এ, এফ, এম, আবদুল জলিল সাহেব লিখেছেন, "পয়গ্রাম কসবায় বিখ্যাত পীর আলী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। যশোর অঞ্চলের একজন ব্রাহ্মণ খান জাহানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ইসলাম কবুল করেন। তাঁহার নাম মোহাম্মদ তাহের। এই ব্রাহ্মণ সন্তানের পূর্ব পরিচয় অস্পষ্ট। সতীশ বাবু

১. যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা – শ্রী সতীশ চন্দ্র মিত্র।
২ . সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা– এ, এফ, এম আবদুল জলিল।

www.pathagar.com

তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণ পরহিংসা করিতে গিয়া আত্মহিংসাই করিয়াছিলেন। কারণ তিনি ধর্ম বা রাজ্য লাভে অথবা সংস্পর্শ দোষে নিজের জাতি ধর্ম বিসর্জন দিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।"[৩] এ, এফ, এম, আবদুল জলিল অন্যত্র লিখেছেন–

"খুলনা জেলার দক্ষিণ ডিহি প্রাচীন হিন্দু প্রধান স্থান। সেনহাটি, মূলঘর কালীয়া প্রভৃতি স্থানের বহুপূর্বে এখানে উচ্চ শ্রেণীর বসবাস ছিল। এই গ্রামের নাম ছিল পয়োগ্রাম, এখনও এ নাম আছে। এখানকার রায় চৌধুরী বংশের তৎকালে বিশেষ খ্যাতি ছিল। সম্ভবতঃ তুর্ক-আফগান আমলের প্রথম দিকে এ ব্রাহ্মণ বংশ রাজ সরকার হইতে সম্মানসূচক রায় চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহারা কনোজাগত ব্রাহ্মণ। ইহাদের পূর্ব পুরুষ গুড় গ্রামের অধিবাসী বলিয়া ইহারা গুড়ী বা গুড়গাঞী ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিত। এই বংশের কৃতি সন্তান দক্ষিণা নারায়ণ ও নাগর নাথ। কথিত আছে যে দক্ষিণা নারায়ণ দক্ষিণ ডিহি এবং নাগর উত্তর ডিহির সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন।

দক্ষিণ ডিহি নামের সহিত দক্ষিণা নারায়ণের সম্পর্ক আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। নাগর বেজের ডাঙ্গায় একটি হাট বাসাইয়া ছিলেন। উহা নাগরের হাট নামে পরিচিত ছিল। খান জাহানের আমলে চৌধুরীগণ সমাজে সম্মানিত ছিলেন। নাগর নিঃসন্তান। ভ্রাতা দক্ষিণা নারায়ণের চারিপুত্র ছিল। তাহাদের নাম যথাক্রমে কামদেব, জয়দেব, রতিদেব ও শুকদেব। কামদেব ও জয়দেব এই নবগত শাসনকর্তার অধীনে উচ্চপদ গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, মোহাম্মদ তাহেরের চেষ্টায় তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই ঘটনাই ইতিহাসে পীরালিদের উৎপত্তি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।"[৪]

এ সম্পর্কে মিঃ ওমালি বলেন, "খান জাহান একদা রোজার সময় ফুলের ঘ্রাণ লইতে থাকেন। ইহাতে তদীয় হিন্দু কর্মচারী মোহাম্মদ তাহের (তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই) বলেন যে, "ঘ্রাণেন কার্ধ বোজনং" অর্থাৎ ঘ্রাণে অর্ধ ভোজন। খান জাহান পরে একদিন খানাপিনার আয়োজন করেন। মাংসের গন্ধে তাহের নাকে কাপড় দিলে খান জাহান বলেন, যখন ঘ্রাণে অর্ধ ভোজন তখন এই খানা ভক্ষণের পর আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন। তদানুসারে তাহের ইসলাম গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, তাহেরের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যে পুত্র সন্তান ছিলেন তিনি হিন্দু থাকিয়া যান। তিনিই সর্বপ্রথম হিন্দু পীরালী এবং তাহেরকে লোকে উপহাসচ্ছলে পীরালি বলিত। তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া এদেশে পীরালি গান ও বহু

৩. সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা– এ, এফ, এম আবদুল জলিল।
৪. সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা– এ, এফ, এম আবদুল জলিল।

www.pathagar.com

কাহিনী রচিত হয়। ঐকান্তিক ধর্মনিষ্ঠার জন্য শেষ পযন্ত তাহের পীরালি আখ্যা পান।"[৫]

অন্য এক বর্ণনা মতে, "মোহাম্মদ তাহেরের সঙ্গে জয়দেব ও কামদেবের অন্তরের মিল ছিল না। তাহের মনে মনে তাঁহাদিগকে মুসলমান করিবার চেষ্টা করিতেন। এ সম্পর্কে এতদঞ্চলে একটি গল্প প্রচলিত আছে, উহা কতদূর সত্য জানি না। গল্পটি বর্ণনা করিতেছি– একদিন পবিত্র রমজানের সময় তাহের রোজা রাখিয়াছেন। দরবার গৃহে জয়দেব ও কামদেব অন্যান্য কর্মচারীসহ বসিয়া আছেন। এমন সময় ব্যক্তি এক ব্যক্তি তাঁহার বাটি হইতে একটি সুগন্ধি নেবু আনিয়া তাহেরকে উপহার দেন। পীরআলী নেবুর ঘ্রাণ লইতেছিলেন। এমন সময় কামদেব বলিলেন হুজুর, ঘ্রাণে অর্ধ ভোজন– 'ঘ্রাণেন কার্ধ ভোজনং' – আপনি গন্ধ শুকিয়া রোজা ভাঙ্গিয়া রোজা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন? এ কথার পর পীরআলি ব্রাহ্মণের প্রতি চটিয়া যান। গোপনে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, একদিন তিনি সমস্ত কর্মচারীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইবেন। নির্ধারিত দিনে কামদেব ও জয়দেব সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সভাগৃহের প্রাঙ্গনে গো-মাংসের সহিত নানা প্রকার মসলা দিয়া রন্ধন কার্য ধুমধামের সহিত চলিতেছিল। রান্নার গন্ধে সভাগৃহ ভরপুর। জয়দেব ও কামদেব নাকে কাপড় দিয়া প্রতিরোধ করিতেছিলেন। পীরআলী নাকে কাপড় কেন জিজ্ঞাসা করিলে কামদেব মাংস রন্ধনের কথা উল্লেখ করেন। পীরআলী নেবুর গল্প উল্লেখ করিয়া বলিলেন– 'এখানে গো-মাংস রন্ধন হইতেছে। ইহাতে আপনাদের অর্ধেক ভোজন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আপনারা জাতিচ্যুত হইয়াছেন।

অতঃপর কামদেব ও জয়দেব ঐ মাংস খাইয়া মুসলমান হইয়া গেলেন। পরীআলী তাঁহাদিগকে জামাল উদ্দীন, কামাল উদ্দীন খাঁ চৌধুরী উপাধি দিয়া আমাত্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন। সংশ্রব দোষে অন্য দুই ভ্রাতা শুকদেব ও রতিদেব পীরালী ব্রাহ্মণ হিসাবে সমাজে পরিচিত হইলেন। ইহাই পীরালি সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ইতিকথা।"[৬]

এ প্রসঙ্গে জনৈক নীলকান্তের বরাত দিয়ে 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থে ঘটকদিগের পুঁথি থেকে কিছু উল্লেখ করেছেন, তা হল–

খান জাহান মহামান পাতশা নফর।
যশোর সনন্দ লয়ে করিল সফর ॥
তার মুখ্য মহাপাত্র মামুদ তাহির।

৫. সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৩৩৩/৩৩৪ পৃষ্ঠা– এ, এফ, এম আবদুল জলিল।
৬. সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৩৩৪ পৃষ্ঠা– এ, এফ, এম আবদুল জলিল।

www.pathagar.com

মারিতে বামুন বেটা হইল হাজির ॥
পূর্বেতে আছিল সেও কুলীনের নাতি।
মুসলমানী রূপে মজে হারাইল জাতি ॥
পীর আলী নাম ধরে পীরাল্যা গ্রামে বাস।
যে গাঁয়েতে নবদ্বীপের হইল সর্বনাশ ॥
সুবিধা পাইয়া তাহির হইল উজীর।
চেঙ্গুটিয়া পরগনায় হইল হাজির ॥

এখানে লেখক খান জাহানকে কোন মুসলমান সুলতানের সনদ প্রাপ্ত প্রশাসক বলে উল্লেখ করেছেন। এরপর মুহাম্মদ তাহিরের পরিচয় তুলে ধরে বলতে চেয়েছেন ইসলামের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে নয় বরং কোন নারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে সে মুসলমান হয়েছে। প্রকারান্তরে লেখক (সম্ভবত) বলতে চেয়েছেন ইসলাম প্রচার এদেশে কৌশলে হয়েছে। পুঁথির অনত্র এ ব্যাপারে বলা হয়েছে–

আঙ্গিনায় বসে আছে উজীর তাহির।
কত প্রজা লয়ে ভেট করিছে হাজির ॥
রোজার সে দিন পীর উপবাস ছিল।
হেন কালে একজন নেবু এনে দিল ॥
গন্ধামোদে চারিদিকে ভরপুর হইল।
বাহবা বাহবা বলে নাকেতে ধরিল ॥
কামদেব জয়দেব পাত্র দুইজন।
বসে ছিল সেইখানে বুদ্ধে বিচক্ষণ ॥
কি করেন কি করেন বলিলা তাহিরে।
ঘ্রাণেতে অর্ধেক ভোজন শাস্ত্রের বিচারে ॥
কথায় বিদ্রূপ ভাবি তাহির অস্থির।
গোঁড়ামি ভাঙ্গিতে দোহের মনে কৈলা স্থির ॥
দিন পরে মজলিস করিল তাহির।
জয়দেব কামদেব হইল হাজির ॥
দরবারের চারিদিকে ভোজের আয়োজন।
শতশত বকরী আর গো-মাংস রন্ধন ॥
পলাণ্ডু রশুন গন্ধে সভা ভরপুর।
সেই সভায় ছিল আরও ব্রাহ্মণ প্রচুর ॥
নাকে বস্ত্র দিয়া সবে প্রমাদ গণিল।
ফাঁকি দিয়া ছলে বলে কত পালাইল ॥

www.pathagar.com

কামদেব জয়দেবে করি সম্বোধন।
হাসিয়া কহিল ধূর্ত তাহির তখন ॥
জারি জুরি চৌধুরী আর নাহি খাটে।
ঘ্রাণে অর্ধেক ভোজন শাস্ত্রে আছে বটে ॥
নাকে হাত দিলে আর ফাঁকি তো চলে না।
এখন ছেড়ে ঢং আমার সাথে কর খানাপিনা ॥
উপায় না ভাবিয়া দোহে প্রমাদ গণিল।
হিতে বিপরীত দেখি শরম মরিল ॥
পাকড়াও পাকড়াও হাঁক দিল পীর।
থতমত হয়ে দোহে হইল অস্থির ॥
দুইজনে ধরি পীর খাওয়াইল গোস্ত।
পীরালী হইল তাঁরা হইল জাতি ভ্রষ্ট ॥
কামাল জামাল নাম হইল দোহার।
ব্রাহ্মণ সমাজে পড়ে গেল হাহাকার ॥
তখন ডাকিয়া দোহে আলী খানজাহান।
সিঙ্গির জায়গীর দিল করিতে বাখান ॥

'নবদীক্ষিত কামাল উদ্দীন ও জামাল উদ্দীন প্রচুর সম্পত্তির জায়গীর পাইয়া সিঙ্গিয়া অঞ্চলে বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণ খুব সম্ভব খান জাহানের পয়গ্রাম ত্যাগের পরেই হইয়াছে। কথিত আছে খান জাহান তাঁহাদিগকে উচ্চ সম্মানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তিনি বাগের হাট অবস্থানকালে এই দুই ভ্রাতা মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে তথায় আসিতেন। বাগের হাটের পশ্চিমে সোনাতলা গ্রামে আজিও কামাল খাঁ নামীয় দীঘি তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।'[৭]

ছল চাতুরী বা কলা কৌশল নয় ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই হযরত পীর আলী মুহাম্মদ তাহিরের হাতে হাজার হাজার অমুসলিম ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন। এই নবদীক্ষিত মুসলমানরা পীরেলি নামে পরিচিত হন। আর যে হিন্দু মুসলমান হতেন, তার হিন্দু আত্মীয়রা ঐ বংশের লোকদেরকে সমাজচ্যুত করতো। তারা পীরেলি ব্রাহ্মণ বা পীরেলি কায়স্থ হিসাবে পরিচিত হন। এই পীরেলিদেরকে কুলীণ ব্রাহ্মণরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বলতেন–

মোসলমানের গোস্ত ভাতে
জাত গেল তোর পথে পথে
ওরে ও পীরেলী বামন।

৭. সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা– এ, এফ, এম আবদুল জলিল।

www.pathagar.com

জানা যায়, 'পীরালি সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য বহন করতো। তাই দেখতে পাই, কলকাতার জোড়া সাঁকোর ঠাকুর পরিবার, সিঙ্গিয়ার মুস্তফী পরিবার, দক্ষিণ ডিহির রায় চৌধুরী পরিবার, খুলনার পিঠাভোগের ঠাকুর পরিবার, এই পীরালিদের উত্তরাধিকারী হিসাবে চিহ্নিত। বর্তমান শতকের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথও এই পীরালি ঠাকুর পরিবারেরই সুসন্তান।

সংশ্রব দোষে রায় চৌধুরী বংশের লোকেরা পুত্র কন্যার বিবাহ লইয়া বিড়ম্বিত হইয়া পড়ে। তখন তাহারা প্রতিপত্তি ও অর্থ বলে সমাজকে বাধ্য করিবার জন্য চেষ্টা চালাইতে লাগিল। ইহাদের সহিত কলিকাতার ঠাকুর বংশ এবং আরও কতিপয় বংশ সংশ্রব দোষে পতিত হইয়াছিল। কলিকাতার ঠাকুরগণ ভট্টানারায়ণের সন্তান এবং কুশারী গাঁঞিভুক্ত ব্রাহ্মণ। খুলনা জেলার আলাইপুরের পূর্বদিকে পিঠাভোগে কুশারীদের পূর্ব নিবাস ছিল। পীঠাভোগের কুশারীগণ রায় চৌধুরীদের সহিত আত্মীয়তা করিয়া পীরালী হন।'[৮]

'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', ব্রাহ্মণ কাণ্ড, তৃতীয় ভাগ, ষষ্ঠ অংশের ১৭২ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, 'বর্তমান কালে খুলনা জিলার অন্তর্গত পিঠাভোগ গ্রামের কুশারী মহাশয়েরা চেঙ্গুটিয়ার গুড় চৌধুরীগণের ন্যায় শক্তিশালী প্রবল শ্রোত্রিয় জমিদার ছিলেন। ইহারা শাণ্ডিল্য ভট্টনারায়ণ পুত্র দীন কুশারীর বংশধর। যে সময় শুকদেব রায় চৌধুরী বিশেষ বিখ্যাত জমিদার হইয়াছিলেন। ইনি পিঠাভোগের কুশারী বংশীয় সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমন্ত খানের কোন আত্মীয় হওয়াই সম্ভব।'[৯]

"কুশারী বংশের পঞ্চানন থেকেই পরবর্তীকালে কলকাতার জোড়া সাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠা হয়।"[১০]

অন্যদিকে মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁকে অনেকেই পীরালী বংশোদ্ভূত মনে করেন। এ প্রসঙ্গে এ, এফ, এম, আবদুল জলিল বলেন, "মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ এই পীরালি বংশের কৃতি সন্তান। তাঁহার আত্মীয় স্বজন পীরালি খাঁ বলিয়া পরিচিত। আমি মাওলানা সাহেবের সঙ্গে এই বিষয় আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার বংশ পীরালি তাহা তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, গৌড়ের সুলতান যদু বা জালাল উদ্দীনের সময় হইতে তাঁহারা মুসলমান এবং জনৈক আলী খানের বংশধর।"[১১]

---

৮. সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৩৩৭ পৃষ্ঠা– এ, এফ, এম আবদুল জলিল।

৯. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, তৃতীয় ভাগ, ষষ্ঠ অংশের ১৭২ পৃষ্ঠা – নগেন্দ্রনাথ বসু।

১০. খুলনা জেলায় ইসলাম, ৭১ পৃষ্ঠা – মুহম্মদ আবু তালিব।

১১. সুন্দর বনের ইতিহাস। ৩৩৭ পৃষ্ঠা– এ, এফ, এম আবদুল জলিল।

www.pathagar.com

এ বিষয়ে হান্টার সাহেব বলেছেন, "সমস্ত রায়চৌধুরীগণ খান চৌধুরীতে পরিণত হয়। কিন্তু মাওলানা সাহেবের বংশ খান চৌধুরী নহে, শুধু খাঁ উপাধিধারী।"[১২]

অন্যত্র এ, এফ, এম আবদুল জলিল সাহেব লিখেছেন, "কলিকাতা এবং স্থানীয় সাম্ভব্য সমস্ত সূত্র হইতে জানিয়া আমাদের মন্তব্য সন্নিবেশিত করিলাম। রায় চৌধুরী বংশের পূর্ব পুরুষদের সহিত রবি বাবুর যেরূপ রক্ত সম্পর্ক, মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের সম্পর্ক ঠিক ততটুকু।"[১৩]

"হযরত পীর আলী মুহাম্মদ তাহির পয়গ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন বলে জানা যায়। জানা যায়, পরে তিনি খলিফাতাবাদ রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।"[১৪]

প্রখ্যাত গবেষক জনাব অধ্যাপক আবূ তালিব বৈষ্ণব ধর্মের প্রবক্তা শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত আদর্শ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, " সত্যি বলতে কি, পীরালী আবূ তাহিরই ছিলেন শ্রীচৈতন্যের পূর্বসূরী। আবূ তাহিরের আবির্ভাব যাদেরকে পবিত্র ইসলাম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করেছিল, শ্রী চৈতন্য তাদেরকে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন।"[১৫]

এরপরই তালিব সাহেব বলেছেন, "ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে পীরালী সাহেব শ্রীচৈতন্যের দিশারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁরই পথের অনুসারী ছিলেন। আরও বলা যেতে পারে, নির্যাতিত হিন্দু পীরালী সমাজ একাধারে চৈতন্যের ধর্ম ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে শান্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"[১৬]

যা হোক পীর আলী মুহাম্মদ তাহিরের প্রধান কর্মকেন্দ্র হয় পয়গ্রাম কসবায়। "হযরত খানজাহান এই গ্রামটিকে তার বিশাল সাম্রাজের ভবিষ্যত রাজধানী শহর করার সুসংবাদ দান করেন। এবং অবিলম্বে গ্রামটিকে একটি 'কসবা' বা শহরে পরিণত করেন।"[১৭]

পীর আলী মুহাম্মদ তাহিরের জন্মস্থান হচ্ছে যশোর জেলার নড়াইল-মহকুমার (বর্তমান জেলা) পেড়োলি গ্রামে। হযরত পীর আলী'র নামেই গ্রামটির নামকরণ হয় 'পীরালী'। বর্তমানে নামটির বিকৃত রূপ হচ্ছে 'পেড়োলি'।

---

১২. সুন্দর বনের ইতিহাস। ৩৩৭ পৃষ্ঠা– এ, এফ, এম আবদুল জলিল।
১৩. সুন্দর বনের ইতিহাস। ৩৩৮ পৃষ্ঠা– এ, এফ, এম আবদুল জলিল।
১৪. হযরত খান জাহান আলী (রঃ), ৬ পৃষ্ঠা – সেলিম আহমদ।
১৫. খুলনা জেলায় ইসলাম, ৬৯ পৃষ্ঠা – মুহম্মদ আবূ তালিব।
১৬. খুলনা জেলায় ইসলাম, ৬৯ পৃষ্ঠা – মুহম্মদ আবূ তালিব।
১৭. খুলনা জেলায় ইসলাম, ৬৮ পৃষ্ঠা – মুহম্মদ আবূ তালিব।

www.pathagar.com

হযরত পীর আলী'র নিকট এত অধিক সংখ্যক ব্রাহ্মণ মুসলমান হন যে, নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ আর ছিল না বললেই চলে। এ জন্য অন্যান্য হিন্দু ব্রাহ্মণগণ ভয় পেয়ে যায় ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে-এর স্বাক্ষ্য মেলে–

পীরাল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ।।
ব্রাহ্মণ জবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পীরাল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে।।

কবি আরো বলেন–

পীর আলী নাম ধরে পীরাল্যা গ্রামে বাস।
যে গায়েতে নবদ্বীপের হৈল সর্ব্বনাস।।

অথবা

"বিষম পীরাল্যা গ্রাম নবদ্বীপের আড়ে।"

৮৬৩ হিজরী মোতাবেক ১৪৫৯ সালে এ মহান কামেলে দ্বীন ও ইসলাম প্রচারক ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাজার বাগেরহাট হযরত উলূঘ খান জাহান আলী (র.)-এর মাজারের পাশেই রয়েছে। এ সম্বন্ধে সতীশ চন্দ্র মিত্র লিখেছেন, "মহম্মদ তাহের এখানে মারা যান নাই, এখানে মাত্র তাঁহার একটি শূন্যগর্ভ সমাধিবেদী গাঁথা রহিয়াছে।.... বন্ধুর স্মৃতি চিহ্ন রাখা কর্তব্য এই বুদ্ধিতে খাঁ জাহান মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সেই একই জেলহজ্জ মাসে মহম্মদ তাহেরের জন্য এই স্মৃতি স্তম্ভ গঠিত করিয়া রাখিয়া যান। সমাধির উপরি ভাগটি প্রায় খাঁ জাহানের সমাধির ন্যায়, তবে ইহার ভিতরে কিছুই নাই, সিঁড়ি দিয়া তন্মধ্যে অবতরণ করা যায়।"[১৮] সতীশ বাবুর এ মন্তব্যের সাথে আমরা কোন ক্রমেই একমত হতে পারি না। কবরের নীচে এ ধরনের সুড়ঙ্গের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। তা'ছাড়া আমরা পূর্বেই তাঁর মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করেছি।

তাঁর মাজারের শিলালিপিতে লেখা আছে, "হাজিহি রওজাতুন মুবারাকাতুন মির রিয়াজিল জান্নাতি ওয়া হাজিহি সাখরিয়া তুল লিহাবীবিহি এসমুহু মুহাম্মদ তাহির ছালাছা সিত্তিনা ওয়া সামানিয়াতা।" অর্থাৎ এই স্থান বেহেশতের বাগিচা সাদৃশ এবং ইহা জনৈক বন্ধুর মাযার, নাম – আবু তাহির, ওফাতকাল – ৮৬৩ হিঃ/ ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দ। এই একই বৎসর হযরত খান জাহান (রঃ)-এর ওফাত হয়। ◎

১৮. যশোর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা – সতীশ চন্দ্র মিত্র।

www.pathagar.com

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মধ্যমণি

মহাকবি আলাওল

আমরা আজ যাঁকে নিয়ে আলোচনা করব তিনি ছিলেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মধ্যমণি। আধুনিককালেও যাঁকে মহাকবি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এই বহুভাষাবিদ পন্ডিত, অনুবাদক মহাকবি সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে তাঁর যুগ সম্বন্ধে জেনে নিলে মনে হয় সবার জন্য সুবিধা হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের পুরাতন বলে মনে করা হয়। এই হাজার বছরকে পন্ডিতেরা তিন ভাগে ভাগ করেছেন— প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক। ৬৫০ খৃঃ থেকে ১২০০ খৃঃ পর্যন্ত প্রাচীন যুগ, ১২০১ খৃঃ থেকে ১৮০০ খৃঃ পর্যন্ত মধ্যযুগ এবং ১৮০১ খৃঃ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আধুনিক যুগ। অবশ্য হিন্দু পণ্ডিতেরা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ১২০১ খৃঃ থেকে ১৩৫০ খৃঃ পর্যন্ত অন্ধকার যুগ বলে থাকে। কারণ এই দেড়শ বছর মুসলমানদের ভারত আগমন তথা বাংলাদেশ দখলের দরুন কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি বলে তারা মনে করে। অথচ সত্যি কথা হলো এই সময়েও সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন শূন্য পুরাণ, কলিমা জালাল বা নিরঞ্জনের রুষ্মা, ডাক ও খনার বচন, সেক শুভোদয়া ইত্যাদি।

কবিগুরু মহাকবি আলাওল বা আলাউল এই মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে কারো কারো মতে ১৬০৫ বা ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার জালালপুরে জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য দু'একজন পন্ডিত কবি আলাওলের জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার জোবরা গ্রামে বলে মনে করেন। কিন্তু কবির নিজের উক্তিকে সামনে রেখে প্রায় সকল পণ্ডিতগণই ফরিদপুর জেলার জালালপুরের পক্ষে রায় দিয়েছেন। কবির পিতা ছিলেন ফতেহাবাদের রাজ্যেশ্বর মজলিশ কুতুবের মন্ত্রী। কবি তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্যে আত্মকথায় লিখেছেন—

মুলুক ফতেয়াবাদ গৌড়েতে প্রধান।
তাহাতে জালাল পুর অতি পুণ্যস্থান॥
বহুগুণবন্ত বৈসে খলিফা ওলেমা।
কথেক কহিব সেই দেশের মহিমা॥
মজলিস কুতুব তখত অধিপতি।
মুই দীনহীন তান অমাত্য সন্ততি॥

www.pathagar.com

মহাকবি আলাওল ছিলেন ভাগ্যবিড়ম্বিত এক কবি। তিনি কৈশর বয়সে মন্ত্রী পিতার সাথে কার্যোপলক্ষে কোথাও যাত্রাকালে পথিমধ্যে দুর্ধর্ষ হার্মাদ জল দস্যুর কবলে পড়েন। কবির পিতা জলদস্যুদের হাতে শহীদ হন। কবি নিজে আহত হলেও প্রাণে রক্ষা পান। এরপর অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে, অনেক পথ অতিক্রম করে তিনি আরাকানে এসে উপস্থিত হন। বেঁচে থাকার তাগিদে কবি মগরাজার সেনাবাহিনীতে রাজ-আসোয়ারের চাকরি গ্রহণ করেন। রাজ-আসোয়ার মানে অশ্বারোহী সৈনিক। এ সময়ে আরাকান রাজ সভায় একটি চমৎকার সাহিত্যিক আবহাওয়া বিরাজ করছিল। গুণী ব্যক্তিদেরকে যথেষ্ট সম্মানের চোখে দেখা হত। সে যে ধর্মাবলম্বীই হোক না কেন। কবি নিজেই লিখেছেন,

বহু বহু মুসলমান রোসাঙ্গে বৈসন্ত।
সদাচারী, কুলীন, পন্ডিত, গুণবন্ত॥

ফলে অচিরেই কবি আলাওলের গুণগরিমা, বিদ্যা-বুদ্ধি ও সাহিত্য প্রতিভার কথা অভিজাত মহলে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি আরাকানের প্রধানমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করেন। কবি বলেন,

তালিব আলিম বুলি মুঞি ফকিরেরে।
অন্নবস্ত্র দিয়া সবে পোষন্ত আদরে॥

মূলত এখান থেকেই আলাওলের কাব্য সাধনার শুরু এবং এক আমত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ক্রমাগত ১৬৫১ খৃস্টাব্দ থেকে ১৬৭৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। মাঝে কবির ওপর দিয়ে বয়ে যায় নানা ধরনের ঝড়ঝঞ্ঝা। কবিকে অনেক কষ্ট-ক্লেশে নিপতিত হতে হয়। ১৬৫৯ খৃস্টাব্দে শাহসূজা বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে আরাকানে আশ্রয় লাভ করেন। যে কোন কারণেই হোক ১৯৬১ খৃস্টাব্দে তিনি আরাকান রাজ্যের বিরাগভাজন হয়ে নিহত হন। এ সময়ে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কবি আলাওল কারারুদ্ধ হন। পঞ্চাশ দিন কারাভোগের পর তিনি মুক্তি পান কিন্তু পরিবেশ প্রতিবেশ সবই কবির বিরুদ্ধে চলে যায়, তিনি অতি কষ্টে দিনাতিপাত করতে থাকেন। ঠিক এ সময়ে কবির প্রধান পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুরের মৃত্যু হলে কবির দুর্ভোগ আরো বেড়ে যায়। এমনকি এ সময়ে তিনি ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে রোসাঙ্গ রাজসভার আমত্য সৈয়দ মূসা, সমরসচিব সৈয়দ মুহম্মদ খান, রাজমন্ত্রী নবরাজ মজলিস, অন্যতম সচিব শ্রীমন্ত সোলেমান প্রমুখদের নজরে আসেন। ফলে পুনরায় অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়।

তোমরা জানলে খুশি হবে যে, সেই যুগেও মহাকবি আলাওলের জানা ছিল অনেকগুলো ভাষা। তিনি মৈথিল, ব্রজভাখা, ঠেট, খাড়িবোলির মত উত্তর ভারতের

www.pathagar.com

উপভাষা ছাড়াও বাংলা, সংস্কৃত, আরবী ও ফারসীতে সমান দখল রাখতেন। অপর দিকে তাসাউফ ও যোগ-তন্ত্রেও ছিল পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান। যার কারণে তিনি অনুবাদে ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। সত্যি কথা বলতে তাঁর মত অনুবাদক কদাচিৎ দু'একজন মিলে। তিনি কাব্য ক্ষেত্রে ছিলেন স্বচ্ছন্দ। কাব্যতত্ত্ব, অলংকার শাস্ত্র ও ছন্দবিজ্ঞান ছিল তাঁর আয়ত্বে। এমন কি তিনি কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাংলায় প্রয়োগ করেন। আর রোসাঙ্গে তিনি তো সঙ্গীত শিক্ষক রূপেই পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

আলাওল অনেকগুলো পুস্তক রচনা করেন। তার মধ্যে—

১. পদ্মাবতী ঃ প্রখ্যাত হিন্দি কবি মালিক মুহাম্মদ জায়সীর 'পদুমাবত' কাব্যের বঙ্গানুবাদ। ১৬৫১ খৃস্টাব্দে মাগন ঠাকুরের নির্দেশে আলাওল 'পদ্মাবতী' অনুবাদ করেন। এ কাব্যটি আলাওলের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য।

২. সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল ঃ আলাওলের দ্বিতীয় কাব্য। ১৬৫৮ খৃস্টাব্দে মাগন ঠাকুরের পরামর্শে ও উৎসাহে এ কাব্য লেখা শুরু করেন এবং পরে ১৬৬৯ খৃস্টাব্দে রোসাঙ্গ রাজের আমত্য সৈয়দ মূসার অনুরোধক্রমে তা সমাপ্ত করেন। এটি প্রেম মূলক কাহিনী কাব্য।

৩. সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী ঃ দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য আমত্য সুলায়মানের অনুরোধে ও উৎসাহে ১৬৫৯ খৃস্টাব্দে সমাপ্ত করেন। এ কাব্যগ্রন্থটি আলাওলের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ।

৪. সপ্তপয়কার ঃ পারস্য কবি নিজামীর সপ্তপয়কর নামক কাব্যের ভাবানুবাদ। রোসাঙ্গরাজের সমরমন্ত্রী সৈয়দ মহম্মদের আদেশে ১৬৬০ খৃস্টাব্দে আলাওল এটির অনুবাদ করেন।

৫. তোহফা ঃ এ গ্রন্থটিও অনুবাদ। বিখ্যাত সূফী সাধক শেখ ইউসুফ গদা দেহলভীর 'তোহ্ফাতুন নেসায়েহ' নামক ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ। ১৬৬৪ খৃস্টাব্দে আলাওল এ কাব্যগ্রন্থটি সমাপ্ত করেন। এটি আলাওলের পঞ্চম রচনা।

(৬) সেকান্দর নামাঃ এ ষষ্ঠ নম্বর কাব্যটি নিজামী গঞ্জভীর ফারসী সেকান্দর-নামা গ্রন্থের অনুবাদ। আলাওল এ কাব্যটি সম্ভবত ১৬৭২ খৃস্টাব্দে রচনা করেন। আরাকান রাজ চন্দ্র সুর্ধমার নবরাজ উপাধীধারী মজলিস নামক জনৈক আমত্যের অনুরোধে আলাওল সেকান্দর নামা অনুবাদ করেন।

সঙ্গীতবিদ হিসাবেও আলাওলের প্রচুর খ্যাতি ছিল। তিনি সঙ্গীতের শিক্ষক ছিলেন। তিনি বেশ কিছু গীতও রচনা করেছেন। অপরদিকে তিনি বাংলা ও ব্রজবুলিতে বৈষ্ণবপদও রচনা করেছেন। ৬০

www.pathagar.com

কবি 'মুকীম' তার সম্বন্ধে লিখেছেন—

গৌরবাসী রৈল আমি রোসাঙ্গের ধাম
কবিগরু মহাকবি আলাওল নাম।

যদিও কবি আলাওলের রচনা অনুবাদ প্রধান তবুও তার অনুবাদ মৌলিক রচনার সমপর্যায়ের। এই অসাধারণ প্রতিভাধর কবি, মহাকবি আলাওল আনুমানিক ৭৬ বছর বয়সে ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। ◎

www.pathagar.com

চৌদ্দশতকে উপমহাদেশে যে সমস্ত পীরে কামিলের পরিচয় আমরা পাই, ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী (রহ.) তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। বর্তমান সময়ে ভারত উপমহাদেশে এত ব্যাপকভাবে গৃহীত আর কোন ব্যক্তি হতে পারেননি। যার কারণে তিনি উভয় বাংলায় মুসলমান তো বটেই হিন্দুদের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হন। সত্যি কথা বলতে কি এখনো পর্যন্ত তাঁর মুরীদগণ বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এই সুফী শ্রেষ্ঠ ও ইসলাম প্রচারক আবুবকর-সিদ্দিকী (রহঃ) পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলার ফুলফুরায় ১২৫৩ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। যেটা বর্তমানে ফুরফুরা শরীফ নামে পরিচিত। হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.) জন্মের মাত্র ৯ মাস পর পিতৃহারা হন। তাঁর পিতার নাম ছিলো গোলাম মোকতাদির। মাতা মুহব্বতুন্নিসা এতিম পুত্রকে লালন পালন করেন এবং তাঁর সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

হযরত আবুবকর সিদ্দিকী (রহ.) ছাত্র হিসেবে ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। প্রথমে সিতাপুর মাদ্রাসা, পরবর্তীতে হুগলী মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। কৃতিত্বের সাথে তিনি মুহসনিয়া মাদ্রাসা থেকে তদানীন্তন মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রী জামাতে উলা পাশ করেন। পরে কলকাতা সিন্ধুরিয়া পট্টির মসজিদে হাফিজ জামালুদ্দিন-এর নিকট তফসীর, হাদীস ও ফিকাহ্ অধ্যয়ন করেন। মওলানা বিলায়েত (রহ.)-এর নিকট কলকাতা নাখোদা মসজিদে তিনি মানতিক হিকমা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর তিনি মদীনা শরীফ যান। সেখানে তিনি হাদীস ও হাদীস সম্বন্ধে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। দেশে ফিরে তিনি এক নাগাড়ে ১৮ বছর অধ্যয়ন অব্যাহত রাখেন। এমনি নিরলস অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি ইসলাম ও অন্যান্য বিষয়ে প্রকৃত পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং কুতুবুল ইরশাদ হযরত ফতেহ্ আলী (রহ.)-এর নিকট বয়'আত হয়ে ইলমে তাসাওউফের সকল তরীকার পূর্ণ কামিলিয়াত হাসিল করেন এবং খিলাফত লাভ করেন।

তিনি শরীয়তের একান্ত পাবন্দ একজন পীরে কামিল ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন শরীয়ত ব্যতীত মারিফত হয় না। এজন্যই বাংলা আসামে তাঁর অগণিত মুরীদ ও একই পন্থা অবলম্বন করে জীবন যাপন করেন। তিনি এও বিশ্বাস করতেন যে, শুধু পীরের সন্তান হলেই পীর হওয়া যায় না। তিনি যে বংশের হউন না কেন যদি শরীয়ত ও মারিফত ইত্যাদিতে কামিল হন তবে তিনিই পীর হতে পারেন।

www.pathagar.com

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রহ.) ছিলেন একজন সুবক্তা। যার কারণে তিনি বাংলা আসামের গ্রামে গ্রামে প্রতিটি অলিতে গলিতে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করতে পেরেছিলেন। তিনি ক্ষেত্র বিশেষে কলমও ধারণ করেছেন– তাঁর লেখা কাওলুল হক (উর্দূ) এবং অছীয়ৎনামা (বাংলা) প্রকাশিত হয়েছে। জানা যায় তিনি আল-আদিল্লাতুর-মুহাম্মদিয়া নামে আরবীতে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যেটি অপ্রকাশিত।

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিল খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চেষ্টা এবং সহযোগিতায় অসংখ্য মক্তব মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। যে সময়ে ভারতীয় মুসলমানগণ ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অনীহা পোষণ করতো সে সময়ে তিনি ইংরেজী শিক্ষার জন্য এদেশের মুসলমানদের প্রতি জোর আহবান জানান। তিনি মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার জন্য মাদ্‌রাসার পাঠ্য তালিকার সংস্কারের জন্য দাবী জানান। তিনি পর্দার সাথে নারীদের শিক্ষা জরুরী বলেও মত প্রকাশ করেন। এমনকি নারীদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্যেও তিনি উপদেশ দেন। একটি তথ্য অনুযায়ী তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ৮০০ মাদ্‌রাসা ও ১১০০ মসজিদ স্থাপন করেন। ১৯২৮ সালে কলকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসার যে প্রথম গভর্ণিং বডি গঠিত হয় তিনি তার সদস্য নির্বাচিত হন।

তিনি ইসলামী সমাজ থেকে শিরক বিদ'আত ও অনৈসলামী কার্যকলাপ উচ্ছেদের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এজন্য ১৯১১ সালে তারই পৃষ্ঠপোষকতায় 'আঞ্জুমানে ওয়াজীন' নামে একট সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। যার কাজ ছিল মুসলিম সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করার জন্য ওয়াজের ব্যবস্থা করা, খৃস্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের জওয়াব দেওয়া এবং অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করা।

তিনি যমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর বাংলা আসামের সভাপতিও ছিলেন। এ সময়ে তিনি আযাদী আন্দোলনে যোগদান করেন। ইসলামী রাজনীতির ব্যাপারে তিনি পরিষ্কার বলেছেন, "রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে আলেমদিগের সরিয়া পড়িবার জন্য আজ মুসলিম সমাজে নানাবিধ অন্যায় ও বে-শরা কাজ হইতেছে।" পরে 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলা আসাম' গঠন করেন।

১৯৩৮ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের তিনি তাঁর মুরিদান ও সাধারণ মুসলমানদের মুসলিম লীগ প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহবান জানান।

তিনি তৎকালীন সময়ে প্রকাশিত মুসলমানদের পত্র-পত্রিকাগুলোকেও সহযোগিতা প্রদান করেন। তাঁর সরাসরি সৃষ্টপোষতায় যে সমস্ত পত্রিকা প্রকাশ হয় তা হল–সাপ্তাহিক মিহির ও সুধাকর, মাসিক নবনূর, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, সাপ্তাহিক

সোলতান, সাপ্তাহিক মুসলিম হিতৈষী, মাসিক ইসলাম দর্শন, সাপ্তাহিক হানাফী, মাসিক শরিয়তে ইসলাম প্রভৃতি।

বাংলা চতুর্দশ শতাব্দীর নকীব, সমাজ সংস্কারক, ইসলাম প্রচারক, মুজাদ্দিদ, অলিয়ে কামিল এদেশের মুসলমানদের নয়নের মণি হযরত মওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.) দীর্ঘদিন রোগে ভোগের পর ১৩৪৫ বাংলা সনের ৩ চৈত্র মুতাবিক ১৯৩৯ সালের ১৭ মার্চ শুক্রবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ফুরফুরা শরীফের মিয়া পাড়া মহল্লায় তাঁকে দাফন করা হয়। প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের ২১, ২২ ও ২৩ তারিখ এখানে ইছালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর খলীফাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন– মওলানা রুহোল আমীন, শর্ষিণার পীর মওলানা নেছারুদ্দীন, মওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী (যশোর), মওলানা আবদুল খালেক, মওলানা সদরুদ্দীন, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মওলানা হাতেম আলী, দ্বারিয়াপুরের পীর মওলানা শাহ সূফী তোয়াজউদ্দীন আহমদ (রহ.) প্রমুখ। ◎

www.pathagar.com

হযরত মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ আবদুল করীম (রহ.)

সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গের ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে শাহ্ মোহাম্মদ আবদুল করীম (রহ)এক চির উজ্জ্বল নক্ষত্র। যখন দক্ষিণ বঙ্গের অলিতে গলিতে চলছিলো হিন্দু ও খৃষ্টান মিশনরীদের অপদৌরাত্ম,যখন ইসলামের বিরুদ্ধে তারা অপপ্রচারের ভয়াবহ বন্যার "াষ্টি করেছিলো তখনই এই মহান সূফী ইসলামের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেন।

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল করীমের পূর্ব পুরুষ ছিলেন–হযরত শাহ সূফী সুলতান আহমদ। তিনি মুগল সম্রাট আকবরের সময়ে যশোর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। জানা যায়,সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহের পদাতিক বাহিনীর প্রধান হিসাবে তিনি যশোর আগমন করেন এবং যশোর অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ও ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে যশোর থেকে যান। সে সময়ে যশোরের চাঁচড়ার রাজা ছিলেন শূকদেব সিংহ্ রায়।

রাজা শূকদেব হিংস রায় রাজা মানসিংহকে ও সম্রাট আকবরের খুশী করার উদ্দেশ্যে শাহ সূফী সুলতান আহমদকে বসবাসের জন্য রাজবাড়ির খিড়কীর দিকে বেশ কিছু লাখেরাজ সম্পত্তি প্রদান করেন। খিড়কী এলাকা পরে খড়কী এলাকায় পরিণত হয়।' বর্তমানে খড়কী যশোর শহরের একটি অংশ। যশোর সরকারী এম. এম.কলেজ এই খড়কীতে অবস্থিত।

মুগল আমল থেকে বর্তমান প্রজন্ম পর্যন্ত হযরত মওলানা শাহ্ আবদুল করীম সাহেবের বংশের লোকেরা যশোর অঞ্চলে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করে আসছেন।

যশোর শহরতলীস্থ খড়কী গ্রামের এক সম্ভ্রান্তপীর পরিবারে হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল করীম ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শাহ মুহাম্মদ সালীম উদ্দীন চিশতী একজন কামিল পীর ছিলেন।

শাহ আবদুল করীম বাল্যকালেই পিতৃহারা হন এবং দাদা শাহ কালিম উদ্দীন চিশতী(রহ)-এর তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন।

দাদা শাহ কালিম উদ্দীন চিশতী দীনি ইলমের প্রাথমিক সবক দিয়ে তাঁর হাতেখড়ি দেন। পরে স্থানীয় বিদ্যালয় হতে ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে তিনি দাদাকে হারান। দাদাকে হারিয়েও শাহ আবদুল করীম তাঁর শিক্ষা জীবনের ইতি টানেন নি। তিনি পরবর্তীতে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে জামা'আতে উলা পাস করেন।

www.pathagar.com

শিক্ষা জীবন শেষে এই মহান মণীষী যশোর জেলা স্কুলে হেড মৌলবী হিসেবে চাকরি গ্রহণ করেন।

শিক্ষকতা করা অবস্থায় তাঁর ভেতর 'ইলমে তাসাওউফ' সম্বন্ধে জানার কৌতুহল জাগে এবং সে সম্বন্ধে জানার জন্য তিনি বেরিয়ে পড়েন। তিনি ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের হুসিয়ারপুর জেলার মৌজা কোর্টের আবদুল খালিক নামক স্থানের প্রখ্যাত সূফী হযরত আবু সা'আদ মুহাম্মদ আবদুল খালিক (রহ.)-এর নিকট মুরীদ হন। এখানে দীর্ঘ বার বছর তিনি তাসাওউফ চর্চায় নিজেকে নিমগ্ন রাখেন এবং ইলমে তাসাওউফের উচ্চ স্তরে উত্তীর্ণ হন। তাঁর পীর তাঁকে নক্‌শ বন্দীয়া মুজাদ্দীদিয়া, কাদিরিয়া, চিশতিয়া ও সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার খিলাফত প্রদান করে স্বদেশ ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন।

স্বদেশে প্রত্যার্তন করার পর তিনি ইসলাম প্রচার শুরু করেন ও সমাজে কুসংস্কার দূর করার প্রচেষ্টা চালান। এ সময় অনেক বিধর্মীই তাঁর সংস্পর্শে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে শাহ্ আবদুল করীম অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে চলাফেরা করতেন। পিতার বিশাল সম্পত্তির উত্তাধিকারী হয়েও তিনি আড়ম্বরহীন, বিনয়ী ও নম্র জীবন যাপন করেছিলেন।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এক সময় যশোর জেলা স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তিনি এই সময় শাহ্ আবদুল করীমের একান্ত সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁর লেখা আধ্যত্ম পুণ্যময় লক্‌খী ছাড়া গল্পটি পীর আবদুল করীম সাহেবকে লক্ষ্য করে (রমনার পীর সাহেব) লেখা। গল্পের নায়ক রমজানকে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ সাহেবের সমকালীন প্রতিনিধি বলা যেতে পারে।

শাহ্ মোহাম্মদ আবদুল করীম একজন উচ্চস্তরের সাহিত্যিকও ছিলেন। ইলমে তাসাওউফের ওপর তিনি এরশাদে খালেকিয়া বা খোদা প্রাপ্তিতত্ত্ব নামক প্রায় তিন'শ পৃষ্ঠা একখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিশিষ্ট গবেষক ও সাহিত্যিক জনাব মুহম্মদ আবূ তালিব লিখেছেন, "বইখানি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়, এ যাবত বাংলা ভাষায় সূফী বা তাসাউফ তত্ত্বমূলক যত বই লেখা হয়েছে, তন্মধ্যে এ খানি শ্রেষ্ঠ।

আবদুল করীম সাহেব ব্যক্তিগতভাবে একজন নিষ্ঠাবান সূফী, তাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে রঙ্গিন এই বইখানি সাধারণ পাঠকের জন্য এক অনাস্বাদিত জগতের সন্ধান এনে দিয়েছে।

সুবিস্তৃত দশটি অধ্যায়ে তিনি তাসাওউফের দার্শনিক তত্ত্ব, বিবিধ সূফী-খান্দানের ইতিকথা, শাজরানামা (পীর-পরম্পরা) ইত্যাদির সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন। শেষ বা

দশম অধ্যায়ে তিনি তাসাউফ তত্ত্বের মর্মকথা, অমুসলিম ধর্ম সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থাদি, যথা– বেদ উপনিষদ পুরানাদির সঙ্গে ইসলামী সূফীতত্ত্বের (Metaphysical) তুলনামূলক আলোচনা করে বিষয়টিকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলেছেন।"

শাহ্ আবদুল করীম সাহেব গ্রন্থটি রচনা করেছেন তাঁর পীর হযরত খাজা আবু সা'আদ মোহাম্মদ আবদুল খালেক সাহেবের অনুপ্রেরণায়।

এ সম্বন্ধে শাহ্ আবদুল করীম সাহেব উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "পীর সাহেব বললেন, তুমি নিজ ভাষায় স্পষ্টভাবে যেমত আমার নিকট শিক্ষা পাইয়াছ সেইরূপ এক খণ্ড কিতাব লিখ। যাহা বুঝিতে লোকের কষ্ট না হয় এবং সন্দেহ ভঞ্জন হয়। কারণ তাসাওউফের বিদ্যা ক্রমশঃ লোপ হইয়া যাইতেছে; কাহাকেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে স্পষ্টভাবে তাহার উত্তর পাওয়া সুকঠিন হইয়াছে; সুতরাং লোকের মূল উদ্দেশ্য পরম সৃষ্টিকর্তা খোদাতালাকে চেনার পথ একেবারে সংকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। অতএব তুমি সত্বর কিতাব লিখিতে প্রবৃত্ত হও।"

পীরের নির্দেশ মুতাবেক লেখক তাঁর কিতাবখানি সর্বসাধারণ বোধ্য ভাষায় লিখেছেন। বলাবাহুল্য, ইসলামী চিন্তা ধারার এক মৌলিক উৎসের সন্ধান দিয়েছে কিতাবখানি।'

গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহিত্যিক জনাব শাহাদত আলী আনসারী বলেন, 'মওলানা মোহাম্মদ আবদুল করীম সাহেব নক্শবন্দীয়া তরিকার একজন কামেল সূফী ছিলেন। সূফী তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁর গ্রন্থখানিতে প্রথম থেকে চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত তিনি তাসাওউফের দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন ; পঞ্চম থেকে নবম অধ্যায়ে সূফী সাধনায় নকশ্বন্দীয়া, কাদেরিয়া এবং চিশতীয়া তরিকার বিশ্লেষণ করেছেন এবং দশম হতে শেষ অধ্যায়ে বেদ, পুরান প্রভৃতিতে প্রচলিত বিষয়বস্তুর তত্ত্ব তিনি উদঘাটন করেছেন এবং সূফী মতবাদের সাথে তার তুলনামূলক সমালোচনা করেছেন। তাসাওউফ সম্পর্কে বাংলা ভাষায় লিখিত এইরূপ দ্বিতীয় কোন বই পাওয়া যায় না।"

শাহ্ আবদুল করীম (রহ.)-এর জীবদ্দশায় গ্রন্থটির দু'টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় শাহ্ সাহেবের মৃত্যুর পর। প্রকাশক ছিলেন মুন্শী শেখ জমির উদ্দিন। গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে শাহ সাহেবের পুত্রদ্বয় (শাহ মোহাম্মদ আবু নঈম ও শাহ্ মোহাম্মদ আবুল খায়ের) লিখেছেন, "পিতৃবন্ধু প্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক রেভারেণ্ড মওলানা শাহ্ সূফী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেবকে অত্র সংস্করণ দান করিলাম। টাইটেল পেজে কেবলমাত্র প্রকাশকের স্থানে তাঁহার নাম থাকিবে।"

www.pathagar.com

গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার দীর্ঘ ৪০ বছর পর প্রখ্যাত সমাজ সেবক ও সাহিত্যিক মরহুম মৌলভী ওয়াহেদ আলী আনসারী ১৩৫৬ সালে এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করেন। এতে ভূমিকা লেখেন শাহ্ সাহেবের পুত্র জনাব শাহ্ মোহাম্মদ আবুল খায়ের। পরবর্তীতে ১৩৮১ সালে তাঁর পৌত্র শাহ্ মোহাম্মদ আবদুল মতিন বইটির পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করেন। এর ৬ষ্ঠ সংস্করণ বের হয়েছে ৩০ মার্চ ১৯৮৬। এ সংস্করণের প্রকাশক শাহ মোহাম্মদ আবদুল মতিন। তিনি বর্তমানে খড়কীর গদ্দীনশীন পীর।

এরশাদে খালেকিয়া বা খোদা প্রাপ্তি তত্ত্ব নামক তাসাওউফের উপর এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় সর্ব প্রথম প্রকাশিত বিস্তারিত ও তত্ত্ব এবং তথ্যবহুল গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত নামক গ্রন্থে প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান এই গ্রন্থখানি সম্পর্কে বলেছেন "মোহাম্মদ আবদুল করীমের খোদাপ্রাপ্তি তত্ত্বের মতো বাংলায় তাসাওয়াফ সম্পর্কিত বই আর দ্বিতীয় দেখা যায় না।" বিশিষ্ট দার্শনিক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন, "প্রকৃত পক্ষে এ পুস্তকখানা সাধনার পথিকদের জন্য একখানা মূল্যবান গ্রন্থ। শাহ মোহাম্মদ আবদুল করীম (রহ.) আমাদের ইতিহাসে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি এদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যে অবদান রেখে গেছেন তা অবিস্মরণীয়।"

শাহ্ মোহাম্মদ আবুদল করীম (রহ.) ১৩২২ বাংলা সনের ৩০ অগ্রহায়ণ খড়কীস্থ নিজ খানকা শরীফে ইন্তেকাল করেন। এখানেই তাঁর মাযার রয়েছে। প্রতিদিন বহু যিয়ারতকারী আসেন। তাঁর নামে যশোর শহরে 'শাহ্ আবদুল করীম সড়ক' রয়েছে। তাঁর বংশধররা আজও ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত আছেন। খড়কীর বর্তমান পীর হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল মতিন শাহ্ আবদুল করীমের পৌত্র। ◎

www.pathagar.com

মহাকবি কায়কোবাদ

কে অই শুনাল মোরে
আজানের ধ্বনি
মর্ম্মে মর্ম্মে সেই সুর   বাজিল কি সুমধুর
আকুল হইল প্রাণ
নাচিল ধমনী
কি মধুর
আজানের ধ্বনি।

যদি তোমাদেরকে এখন প্রশ্ন করি এ কবিতাটি কার লেখা তোমরা নিশ্চয় এক বাক্যে বলবে কবি কায়কোবাদের। হ্যাঁ কবি কায়কোবাদের 'আজান' কবিতার প্রথম স্তবক এটি। তিনি মহাকবি কায়কোবাদ নামেই সবার কাছে পরিচিত। আসলে তার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ কাজেম আল- কোরেশী। জানা যায় হাফিজ উল্লাহ আল-কোরেশী নামে তাঁর জনৈক পূর্ব পুরুষ বাদশাহ শাহাজানের সময়ে বাগদাদ নগরীর নিকটবর্তী কোন স্থান থেকে দিল্লীতে এসে বসতি স্থাপন করেন। হাফিজ উল্লাহ আল -কোরেশী ছিলেন আরবী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত। যে কারণে তিনি সহজেই বাদশাহ শাহাজানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। বাদশাহ তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে দিল্লী জামে মসজিদের সহকারী ইমামের পদে তাকে নিয়োগ দেন। এই হাফিজ উল্লাহ আল-কোরেশীর প্রপৌত্র মাহবুব উল্লাহ আল-কোরেশী দিল্লী থেকে বাংলাদেশে চলে আসেন এবং ফরিদপুর জেলার গোড়াইল গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। আমাদের আলোচ্য কবি এই মাহবুব উল্লাহ আল-কোরেশীর প্রপৌত্র। তাঁর দাদার নাম নেয়ামত উল্লাহ আল-কোরেশী এবং আব্বার নাম শাহমত উল্লাহ আল-কোরেশী ওরফে এমদাদ আলী। তাহলে আমরা অ্যারাবিয়ান নীতিমালা অনুয়ায়ী কবি কায়কোবাদের নাম বলতে পারি, হাফিজ উল্লাহ আল-কোরেশী ইবনে এনায়েত উল্লাহ আল-কোরেশী ইবনে মাহবুব উল্লাহ আল-কোরেশী ইবনে নেয়ামত উল্লাহ আল-কোরেশী ইবনে শাহমত উল্লাহ আল-কারেশী ইবনে মোহাম্মদ কাজেম আল-কোরেশী।

মহাকবি কায়কোবাদ ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে ঢাকা জেলার নওয়াবগঞ্জ থানার আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম জরিফউন্নেছা

www.pathagar.com

খাতুন। কায়কোবাদ ছিলেন বাপ-মায়ের প্রথম পুত্র। তাঁর অন্য দু'জন ভাই হলেন আবদুল খালেক ও আবদুল বারী। তারা দু'জন যথাক্রমে সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ঢাকা মিটফোর্ড (সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ) হাসপাতালের সার্জন ছিলেন।

কায়কোবাদের লেখাপড়া শুরু হয় পিতা শাহমত উল্লাহর কর্মস্থল ঢাকাতে। তিনি ঢাকার পগোজ স্কুলের ছাত্র ছিলেন। অবশ্য ১১ বছর বয়সে মা এবং ১২ বছর বয়সে আব্বা মারা যাওয়ায় ইয়াতিম কবি নানা বাড়ি আগলাপাড়া গ্রামে ফিরে যান এবং সেখানে এক বছর সময় কাটান। পরে তিনি পুনরায় ঢাকাতে ফিরে আসেন এবং ঢাকা মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এ সময়ে মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু রাজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত এবং সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন স্যার হাসান সোহ্‌রাওয়ার্দীর পিতা মওলবী ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহ্‌রাওয়ার্দী। অপরদিকে কবির সহপাঠী ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পিতা জাস্টিস জাহিদ সুহ্‌রাওয়ার্দী। ঢাকা মাদ্রাসায় কায়কোবাদ এন্ট্রান্স পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। মাদ্রাসার শিক্ষা জীবন শেষ হলে তিনি ১৮৮৭ সালে ডাক বিভাগে চাকুরি নিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন এবং ১৯১৯ সালে চাকুরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে ছাত্র জীবনেই তার 'কুসুম কানন' ও 'বিরহ বিলাপ' নামে দু'টি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

আনন্দের কথা হলো এ কাব্যগ্রন্থ দু'টি প্রকাশিত হলে তা পড়ে কাশিম বাজারের মহারাণী দশ টাকা এবং কাশীর ভুবন মোহিনী চতুর্ধারিণী পাঁচ টাকা পাঠিয়ে কিশোর কবি কায়কোবাদকে বরণ করে নেন। ঘটনাটি ছিল নিঃসন্দেহে কবির জন্য উৎসাহ-অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে বড় ধরনের ব্যাপার।

কর্মজীবনে প্রবেশ করার আগেই তিনি অভিভাবকদের মতানুযায়ী মামা হেদায়েত আলী সাহেবের বড় মেয়ে তাহেরউন্নেছা খাতুনকে বিয়ে করেন।

১৩০২ বংগাব্দে ঢাকা থেকে সৈয়দ এমদাদ আলীর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয় 'অশ্রু মালা' খণ্ড কাব্যগ্রন্থটি। এ সময়ে কবি ময়মনসিংহের জামুরকী পোস্ট অফিসে কর্মরত ছিলেন। অশ্রুমালা প্রকাশিত হওয়ার পরপরই কায়কোবাদের কবি খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এমন কি ঐ সময়কার সেরা কবি নবীনচন্দ্র সেন আলিপুর হতে কবিকে লিখে পাঠান—

'মুসলমান যে বাংলা ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারে, আমি আপনার উপহার না পাইলে বিশ্বাস করিতাম না। অল্প সুশিক্ষিত হিন্দুরই বাংলা কবিতার উপর এইরূপ অধিকার আছে।'

১৩১১ বাংলা সনে কবির সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতি 'মহাশ্মশান' মহাকাব্য প্রথম প্রকাশিত হয়। এটিই বাংলা সাহিত্যের সর্ববৃহৎ মাহকাব্য। বাংলা ভাষায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ হবিবর

www.pathagar.com

রহমান সাহিত্যরত্ন ও ফররুখ আহমদ মহাকাব্য রচনা করেছেন। তবে ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে একমাত্র কায়কোবাদই মহাকাব্য রচনা করেন। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নিয়ে এ মহাকাব্য রচিত। মহাকাব্যটি তিনখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে উনত্রিশ সর্গ, দ্বিতীয় খণ্ডে চব্বিশ সর্গ এবং তৃতীয় খণ্ডে সাত সর্গ। সর্বমোট ষাট সর্গে ৮৭০ পৃষ্ঠাব্যাপী এ কাব্য বিস্তৃত। দীর্ঘ দশ বছর সময় লেগেছিল এ কাব্য প্রকাশের জন্য।

এ মহাকাব্য সম্বন্ধে আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছিলেন, 'মহাশ্মশান কাব্য বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে একটি উজ্জ্বল রত্ন। মহাশ্মশানের ন্যায় বৃহদাকার কাব্য বোধহয় বঙ্গ সাহিত্যে আর নাই।'

এই কাব্যের মাধ্যমে কবি মুসলমানদেরকে জাগরণের বাণী শুনিয়েছেন। যেমন—

"পড়ে নাকি মনে সেই অতীত গৌরব ?
সুদূর আরব ভূমে যেই বীর জাতি
মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড প্রায় প্রচণ্ড বিক্রমে
যাইত ছুটিয়া কত দেশ দেশান্তরে
আফ্রিকার মরুভূমে বালুকা প্রান্তরে
বিসর্জিয়া আত্মপ্রাণ কেমন বিক্রমে
স্থাপিয়াছে ধর্মরাজ্য 'আল্লা' 'আল্লা' রবে
আজিও ধ্বনিত সেই নীলনদ তীরে।"

১৩২৮ বংগাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর 'বিশ্বমন্দির' কাব্য। এই কাব্যের বিষয়বস্তু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ভাওয়াল এলাকার মুসলমান জমিদার নুরুউদ্দিন হায়দরের একমাত্র পুত্র আলাউদ্দীন হায়দরকে তারই দেওয়ান সুধীর চন্দ্র জমিদারীর লোভে কূপে ফেলে হত্যা করে এবং এই কূপের উপর নির্মাণ করে এক শিব মন্দির। এই দুঃখজনক ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে শিবমন্দির কাব্য।

১ ফাল্গুন ১৩২৯ বংগাব্দে প্রকাশিত 'অমিয় ধারা' খণ্ড কাব্য। এ কাব্যে অনেকগুলো কবিতা রয়েছে। তবে কাব্যের প্রথম কবিতা 'আজান' খুবই জনপ্রিয় একটি কবিতা। যার প্রথম স্তবক আজকের লেখার শুরুতেই উল্লেখ করেছি।

১৩৩৯ বংগাব্দে প্রাকশিত হয় কায়কোবাদের আরেকখানি মহাকাব্য 'মহরম শরীফ'। কারবালার যুদ্ধের কারণ ও ইতিহাস বিবৃত হয়েছে এ কাব্যে। ৩ খণ্ডে সমাপ্ত এ কাব্য আমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা 'শ্মশান ভস্ম' কাব্য-উপন্যাসখানি ১৩৪৫ বংগাব্দে প্রকাশিত হয়। কায়কোবাদের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়– প্রেম পারিজাত, প্রেমের ফুল, প্রেমের রাণী, মন্দাকিনী ধারা প্রভৃতি কাব্য।

www.pathagar.com

২ সেপ্টম্বর ১৯২৫ খৃ. নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ কায়কোবাদকে 'কাব্যভূষণ', 'বিদ্যাভূষণ' ও 'সাহিত্য রত্ন' উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁকে 'মাইকেল দি সেকেন্ড'ও বলা হত।

কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে দেখা করবার জন্য কায়কোবাদ কলকাতা গিয়েছিলেন। কাজী সাহেবের সাথে দেখা হলে তিনি কায়কোবাদের পা ছুঁয়ে সালাম করে বলেছিলেন, 'ইনিই মহাকবি কায়কোবাদ, মহাশ্মশান অমর কাব্যের স্রস্টা-আমাদের অগ্রপথিক।' এ ঘটনা থেকেই বুঝা যায় কায়কোবাদ কতবড় কবি ছিলেন।

ডক্টর-মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে ১৩৫২ বংগাব্দের ২ বৈশাখ কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ হলে কায়কোবাদকে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

কবি ইসমাইল হোসেন শিরাজী কায়কোবাদকে সম্মাননা হিসেবে সোনার দোয়াত-কলম উপহার দেয়ার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু বিশেষ কারণে তা আর দেয়া সম্ভব হয়নি।

ব্রঙ্কো নিউমেনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ২১ জুলাই ১৯৫১ খৃ. মহাকবি কায়কোবাদ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ঢাকার আজিমপুর গোরস্তানে তাকে সমাহিত করা হয়। ◎

www.pathagar.com

মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা

ঘাস, লতা, ফুল, পাখি দিয়ে ঘেরা একটি জেলা। সমস্ত জায়গায় প্রায় সমতল। সাইক্লোন, বন্যা, ঝড় কোন কিছুই সেখানে তেমন একটা আঘাত হানে না। অধিবাসীদের ভেতর শান্ত সৌমভাব। সবাই যেন কবি। কথায় কথায় কাব্য ঝরে পড়ে। এমনিতেই তাদের কথাগুলো দারুন মিষ্টি। সেই জেলাটির নাম যশোর। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন জেলা অর্থাৎ প্রথম জেলা। ১৭৮৬ সালে তৎকালীন ইংরেজ সরকার এই যশোরকে জেলা হিসাবে ঘোষণা দেন। তারও আগে যশোর স্বাধীন রাজ্য ছিল। তখন নাম ছিল যশোর রাজ্য বা যশোরাদ্য দেশ। এদেশের শাসন কর্তা ছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য, রাজা প্রতাপাদিত্য, রাজা সীতারাম রায়, রাজা মুকুট রায়, হযরত বড়খান গাজী, হযরত খান জাহান আলীর মত ব্যক্তিত্বরা। অবশ্য যশোর কবি সাহিত্যিকের দেশ হিসাবে আবহমান কাল ধরে সবার কাছে পরিচিত। সেই রূপ সনাতন, শ্রীজীব গোস্বামী থেকে শুরু করে লালন শাহ, পাগলা কানাই, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ, ডাঃ লুৎফর রহমান, সৈয়দ আলী আহসান, ডঃ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ডঃ এম, সমসের আলী, সৈয়দ আলী আশরাফ পর্যন্ত সবাই এ জেলারই সুসন্তান। এ জন্য যশোরকে কবি সাহিত্যিকের তীর্থ ক্ষেত্র বলা হয়। আজ আমরা সেই যশোরেরই এক কৃতি সন্তান যিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সমাজ সেবী ও সংগ্রামী তাঁর কথা বলবো, নাম তাঁর মুন্‌সী মেহেরউল্লা।

মুন্‌সী মেহেরউল্লা ১৮৬১ সালের ২৬ ডিসেম্বর যশোর জেলার ঝিনাইদহ (বর্তমানে জেলা) মহকুমার অন্তর্গত কালিগঞ্জ থানার ঘোপ গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ঘোপ গ্রামটি ঐতিহাসিক বারবাজার সংলগ্ন। এই বারবাজার থেকেই সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গে ইসলামের সুমহান বাণী প্রথম প্রচার করেন হযরত বড় খান গাজী (গাজী কালু চম্পাবতী)। এরপর যে মহান মনীষীর আগমনে বারবাজার ধন্য হয় তিনি হলেন হযরত খান জাহান আলী। তাঁর বারজন শিষ্যের নাম অনুসারেই এ স্থানের নাম হয়েছে বারবাজার। এখান থেকেই তিনি বাগেরহাট অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। মেহেরউল্লার পৈত্রিক বাড়ি চূড়ামনকাটী (বর্তমানে মেহেরউল্লাহ নগর) সংলগ্ন ছাতিয়ানতলা গ্রামে। তাঁর আব্বা মুন্সী মোহাম্মদ ওয়ারেছ উদ্দীন অত্যন্ত ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন।

মুন্‌সী মেহেরউল্লা লেখা পড়া বেশী দূর এগুতে পারেননি। কারণ অল্প বয়সেই তিনি পিতৃহারা হন। তাই মায়ের তত্ত্বাবধানে ও নিজের চেষ্টায় তাঁর লেখাপড়া

www.pathagar.com

চলতে থাকে। আর্থিক দৈন্যের কারণে পদে পদে লেখাপড়া বাধাগ্রস্থ হয়। কৈশোর বয়সে তিনি কয়ালখালী গ্রামের মৌলভী মেসবাহ উদ্দীনের কাছে তিন বছর এবং পরে করচিয়া গ্রামের মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের কাছে আরো তিন বছর আরবী, উর্দু ফারসী ভাষা ও সাহিত্য শিখেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী । সে জন্য এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কোরআন ও হাদীসে মোটামুটি জ্ঞানার্জন করেন এবং শেখ সাদীর গুলিস্তা, বোস্তা ও পান্দেনামা মুখস্ত করেন।

কর্ম জীবনের প্রথমে তিনি যশোর জেলা বোর্ডে একটা ছোট চাকরী পান কিন্তু স্বাধীন মনোভাবের কারণে তিনি সে চাকুরী ছেড়ে দেন এবং স্বাধীনভাবে দর্জির কাজ শুরু করেন। দর্জির কাজে তিনি প্রভূত সুনাম অর্জন ও সাফল্য লাভ করেন। যার কারণে জেলা ম্যাটিস্ট্রেট পর্যন্ত তার খরিদার ছিলেন। এমন কি সেই সূত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে দার্জিলিং এ নিয়ে যান এবং দোকান করে দেন।

যশোর শহরের কেন্দস্থল দড়াটানার দর্জির দোকানে কাজ করতে করতে মুনসী মেহেরউল্লা দেখতেন খৃস্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ। এ সময় সমগ্র ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ বেনিয়া শাসক গোষ্ঠীর সহযোগিতায় খৃস্টান মিশনারীরা খৃস্টান ধর্ম প্রচারের নীল নকশা বাস্তবায়নের জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। তাদের এ তৎপরতার ফলে নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা এবং গরীব মুসলমানেরা স্ব-স্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে ব্যাপকহারে খৃস্টান হয়ে যাচ্ছিল। এসব দেখে শুনেও কোন রাজনৈতিক নেতাকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল না। তখন বাধ্য হয়েই তরুণ দর্জি মুন্সী মেহেরউল্লা সিংহের মত গর্জে উঠলেন।

দার্জিলিং অবস্থানকালে তিনি বেদ, উপনিষদ, গীতা, বাইবেল ত্রিপিটক, গ্রন্থ সাহেব প্রভৃতি ধর্ম গ্রন্থগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। এ সময় তিনি তোফাজ্জল মুকতাদী নামক একটি উর্দুগ্রন্থ থেকে বিভিন্ন ধর্মের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি জেনে নিলেন। তাছাড়া হযরত সোলায়মান ওয়ার্সীর লেখা 'কেন আমার পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করেছিলাম', 'প্রকৃত সত্য কোথায়' বই দুটি তার জ্ঞানের পরিধিকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দিল।

তিনি দার্জিলিং থেকে ফিরে এলেন যশোরে। খৃস্টানদের মতই তিনি দড়াটানা মোড় থেকে বাংলা আসাম ও ত্রিপুরার অলিতে গলিতে সভা সমাবেশ করে খৃস্টান ধর্মের অসারতা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। এ প্রচারকে বেগবান করবার জন্য কলকাতা নাখোদা মসজিদে বসে মুন্সী শেখ আবদুর রহীম ও মুন্সী রিয়াজুদ্দীন আহমদ প্রমুখ বিচক্ষণ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় গঠন করলেন নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি। সমিতির পক্ষ থেকে বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব দেয়া হয় মুন্সী মেহেরউল্লা ওপর।

www.pathagar.com

মুন্‌সী মেহেরউল্লা জ্বালাময়ী ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় মানুষ দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে স্থান নিতে লাগল। যাদের মনে ঘুণ ধরেছিল তারা আবার মনটাকে ঠিক করে নিল। জনমিরুদ্দীনের মত তুখেড়ে খৃস্টানও কলেমা পড়ে পুনরায় মুসলমান হলেন।

তিনি যে শুধু বক্তৃতা দিতে পারতেন তা নয়, তার কলমের ধারও ছিল দু'ধারী তলোয়ারের মত। জন জমিরুদ্দীন ১৮৯২ খৃস্টাব্দে খৃস্টান বান্ধব পত্রিকায় 'আসল কোরআন কোথায়' শিরোনামে উদ্ধত্যপূর্ণ একটি প্রবন্ধ লেখেন। এতে জন সাহেব প্রমাণ করার চেষ্টা করেন আসল কোরআন কোথাও নেই। এহেন অযৌক্তিক প্রবন্ধের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন মুন্‌সী মেহেরউল্লা 'সুধাকর' পত্রিকায় 'ইসায়ী বা খৃস্টানী ধোকা ভঞ্জন' শিরোনামের এক গবেষণামূলক প্রবন্ধে। এরপর জন জমিরুদ্দীন সুধাকরে অপর একটি ছোট প্রবন্ধ লেখেন। উত্তরে মেহেরউল্লা "আসল কোরআন সর্বত্র" শিরোনামের সুধাকরে অন্য একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন। উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশ পাওয়ার পর বিরোধী মহলে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এই সময়ে নিকোলাস পাদ্রী অঘোরনাথ বিশ্বাস, রেভারেন্ড আলেকজান্ডার প্রমুখ খৃস্টান ধর্ম প্রচারকগণ মুন্‌সী মেহেরউল্লার সাথে তর্ক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

মুন্‌সী মেহেরউল্লা শুধু খৃস্টানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বিরুদ্ধেই আন্দোলন করেন নি, তিনি মুসলমানদের ভেতর যে মমস্ত কুসংস্কার দেখেছেন তার বিরুদ্ধেও ছিলেন খড়্গ হস্ত। এ সম্বন্ধে জনাব শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন তাঁর কর্মবীর মুন্‌সী মেহেরউল্লা গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "মুন্‌সী মেহেরউল্লার নানা দিকে উৎসাহ ছিল। তিনি মুসলমান সমাজে ব্যবসা বাণিজ্য প্রচলন করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। উৎসাহ দিতেন কৃষি কাজ করার জন্য। তিনি বলতেন, মুসলমান মিঠাই খাইতে জানে কিন্তু তৈয়ারী করতে জানে না। পান খাইতে অজস্র পয়সা নষ্ট করিতে জানে কিন্তু পানের বরজ তৈয়ার করা অপমানজনক মনে করেন। মুন্‌সী মেহেরউল্লা সাহেব মুসলমানগণের মিঠাইয়ের দোকান করিতে পানের বরজ তৈয়ার করিতে সর্বস্থানে উৎসাহ দিতেন, তাঁহার চেষ্টা বহু স্থানেই ফলবতী হইয়াছিল।"

মুন্‌সী মেহেরউল্লা শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা রাখেন। তিনি নিজেই ১৯০১ সালে নিজ গ্রামের পাশের গ্রাম মনোহরপুরে মাদ্‌রাসায়ে কারামতিয়া নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। যেটা বর্তমানে মুন্‌সী মেহেরউল্লা একাডেমী। তিনি বাংলা আসামের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগতভাবে সহযোগিতা করেছেন। তিনি মুসলিম সমাজকে তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্ব বুঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

www.pathagar.com

আমার এখন সর্বস্তরে মাতৃভাষা চালুর জন্য বক্তৃতা করি বিবৃতি দেয়। এ ব্যাপারে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কথা স্মরণ করে ২১ শে ফেব্রুয়ারী ভাষা বিদস উদযাপন করি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এরও অনেক আগে অল্প শিক্ষিত মুন্সী মেহেরউল্লা মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা কি তা হাড়ে হাড়ে বুঝে ছিলেন। যারা মাতৃভাষাকে ছোট করে দেখতো তাদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন, "মাতৃভাষা বাংলা লেখাপড়ায় এত ঘৃণা যে, তাহারা তাহা মুখে উচ্চারণ করাই অপমানজনক মনে করেন। এই অদূরদর্শিতার পরিণাম কি সর্বনাশা তাহা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া ওঠে। যে দেশের বায়ু, জল, অন্ন, ফল, মৎস, মাংস, দুগ্ধ, ঘৃত, খাইয়া তাহাদের শরীর পরিপুষ্ট সে দেশের ভাষার প্রতি অনাদর করিয়া তাঁহারা যে কি সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিতেছে তাহা ভাবিলেও প্রাণে এক ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হয়।"

উপস্থিত বুদ্ধি মুন্সী মেহেরউল্লা এত প্রখর ছিল যে, তৎকালীন সময়ে হিন্দু, মুসলমান ও খৃস্টান সমাজে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না বললেই চলে। উপস্থিত তর্কে তিনি কারো কাছে পরাজিত হয়েছেন এমন কোন তথ্য এ যাবত আমাদের হাতে এসে পৌঁছেনি। বরং বাংলা আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে। তিনি অত্যন্ত রসিক মানুষ ছিলেন। বন্ধুদের রহস্যমূলক প্রশ্নের উত্তর তিনি রহস্য করেই দিতেন।

এই মহান সমাজ সেবক অনেকগুলি বইও লিখেছেন। তার মধ্যে 'মেহেরুল এছলাম', 'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা', 'বিধবা গঞ্জনা', 'রদ্দে খৃস্টান' ও দলিলুল এছলাম" গ্রন্থগুলি খুবই পরিচিত। তাঁর লেখা সাধারণ পাঠকের কাছে খুব জনপ্রিয় ছিল। এ ব্যাপারে তিনি নিজেই লিখেছেন, "যদিও আমি ভাল বাংলা জানিনা তথাপি ক্রমে ক্রমে কয়েকখানি পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছি, তদ্বারা সমাজের কতদূর উপকার সাধিত হইয়াছে বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র জানি যে, এখন আমি খোদার ফজলে সমুদয় বঙ্গীয় মুসলমানের স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছি। আমি দরিদ্র লোকের সন্তান হইলেও আমাকে আর কোন বিষয়ে অভাব অনুভব করিতে হয় না।"

সাহিত্য সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অনেকেই তাঁর সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছেন এবং পরবর্তীকালে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে যে নাম গুলি উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন- ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, কবি গোলাম হোসেন, মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, মাওলানা আকরাম খাঁ প্রমুখ।

www.pathagar.com

তিনি বাংলার জনগণের কাছে এত জনপ্রিয় ছিলেন যে, নোয়াখালির কবি আবদুর রহিম তাঁর আখলাকে আহমদিয়া নামক বইতে লিখেছেন—

মুন্সী মেহেরউল্লা নাম যশোর মোকাম।
জাহান ভরিয়া যার আছে খোশ নাম।
আবেদ জাহেদ তিনি বড় গুণাধার।
হেদায়েতের হাদী জানো দ্বীনের হাতিয়ার।

মুন্সী মেহেরউল্লা ১৯০৬ সালে তাঁর ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট (চেয়ারম্যান) মনোনীত হন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯০৭ সালে মোতাবেক ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২৪ শে জ্যৈষ্ট শুক্রবার মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ইসলামী রেনেসাঁর এ অগ্রনায়ক অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে অসুস্থ্ হয়ে পড়েন এবং নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুতে সারা বাংলা ও আসামে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। সেই সময়ের পত্রপত্রিকায় তার মৃত্যু সংবাদসহ সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী তার শোকোচ্ছ্বাস কবিতায় লিখেছিলেন–

যার সাধানয় প্রতিভা প্রভায় নতুন জীবন ঊষা
উদিল গগনে মধুর লগণে পরিয়া কুসুম ভূষা।
গেল যে রতন হায় কি কখন মিলিবে সমাজে আর?
মধ্যাহ্ন তপন হইল মগন, বিশ্বময় অন্ধকার।

আজ মুন্সী মেহেরউল্লা আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু আছে তাঁর কর্মময় জীবন, আছে তাঁর রচিত সাহিত্য। কি করে একজন সামান্য শিক্ষিত এতিম বালক পরিশ্রম আর আত্মবিশ্বাসের জোরে জনপ্রিতয়তার শীর্ষে উঠতে পারে, কি করে খৃষ্টান মিশনারীদের অপতৎপরতার হাত থেকে স্ব-সমাজকে রক্ষা করতে পারে, তার জ্বলন্ত প্রমাণ মুন্সী মেহেরউল্লা। তিনি যদি সে সময় নিজের উদ্দ্যোগে ময়দানে না নামতেন তা হলে ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের ইতিহাস ভিন্ন হতে পারতো। ছোট বড় সবার উচিৎ তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। তাঁর কর্মময় জীবনের এবং সাহিত্যের ব্যাপক প্রচারও আমাদের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। ◎

www.pathagar.com

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ

উপমহাদেশের সাংবাদিকতা জগতের দিকপাল, মুসলিম গণজাগরণের নকীব, সুসাহিত্যিক, সাংবাদিক, সমাজসেবী মোহাম্মদ আকরম খাঁ পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার হাকীমপুর গ্রামের এক বিখ্যাত পরিবারে ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

গ্রাম্য মক্তবে আকরম খাঁর হাতে খড়ি হয়। অবশ্য পিতা মাতার নিকট তিনি কোরআন, গুলিস্তা বোস্তা ইত্যাদি শিক্ষা করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি তাঁর পিতার সাথে কলকাতা ও পাটনাতে যান এবং তিনি তিন বছর সেখানে অতিবাহিত করেন। ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি ভালবাসার কারণে তিনি ইংরেজী স্কুল ত্যাগ করে ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে কলকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এখান থেকে তিনি কৃতিত্বের সাথে মাদ্‌রাসা ফাইনাল অর্থাৎ এফ, এ. পাশ করেন। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের অনুপ্রেরণায় ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত শিক্ষা সম্মেলনে যোগদান করেন। এ সম্মেলনে যোগদান তাঁর রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশদ্বার।

বাংলার মুসলমানদের সার্বিক উন্নতি কল্পে তিনি নিজেকে সোপর্দ করেন। তাই কর্মজীবনে প্রবেশ করেই ইংরেজী ১৯১০ সালে তিনি 'মাসিক মোহাম্মদী' প্রকাশ করেন। উত্তরকালে মাসিক মোহাম্মদী এদেশের মুসলমানদের মুখপত্র হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। আকরম খাঁ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ইংরেজী ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হন। এ ছাড়া অসহযোগ আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হন। অসহযোগ আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন প্রভৃতি আন্দোলনের কাজের সুবিধার্থে ১৯১১ সালে উর্দু জামানা ও বাংলা দৈনিক সেবক প্রকাশ করেন। ১৯২৯ সালে নেহেরু রিপোর্ট প্রকাশ হলে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং মুসলিম লীগের আদর্শ বাস্তবায়নে উঠে পড়ে লাগেন। এ সময়েই তিনি পাকিস্তানের জনক মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসেন।

সাংবাদিক হিসাবে তিনি ছিলেন আপোষহীন। সেবক পত্রিকার নির্ভীক ভূমিকার কারণে তিনি রাজরোষে পতিত হন এবং এক বছর জেল খাটেন। ১৯৩৫ সালের নির্বাচনের তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ সালে তিনি যুগান্তকারী পত্রিকা দৈনিক আজাদ প্রকাশ করেন, যার প্রকাশনা এখনো অব্যাহত

www.pathagar.com

আছে। দৈনিক আজাদ উপমহাদের মুসলমানের দাবী আদায়ে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে, পাকিস্তান আন্দোলনে, পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

১৯৪১ খৃস্টাব্দে তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং একাধারে ১৯৫১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে জাতির নেতৃত্ব প্রদান করেন। পরবর্তীতে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম গীল ও পরে পাকিস্তান মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং গণপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন।

ইংরেজী ১৯৫৪ সালে গণপরিষদ ভেঙ্গে গেলে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে তিনি দূরে সরে যান এবং ইংরেজী ১৯৬২ সালে আজাদের প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি শুধু সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদই ছিলেন না, তিনি একজন সুসাহিত্যিকও ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে, সমস্যা ও সমাধান, মোস্তফা চরিত, মোস্তফা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খৃস্টান ধর্ম, মুসলিম বাংলার সামাজিক ইতিহাস, তফসীরুল কোরআন (১ম–৫ম খণ্ড) এছাড়াও রয়েছে অসংখ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ। তিনি সকল ক্ষেত্রেই অনাবিল ও উন্মুক্ত মন নিয়ে নির্দ্বিধায় তাঁর মতামত পেশ করেছেন।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিদাতসমূহের চরম বিরোধী ছিলেন। তিনি ব্যক্তি পূজা, কবর পূজা ও অন্যান্য প্রচলিত রসম রেওয়াজের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনি ধারণ করেছিলেন।

ইংরেজী ১৯৪৭ সালে তিনি স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসেন। ইংরেজী ১৯৬৮ সালে মুসলিম বাংলার এই প্রাণপ্রিয় নেতা এবং অভিভাবক সকলকে কাঁদিয়ে ইন্তেকাল করেন। ●

www.pathagar.com

আবদুল করীম সাহিত্য-বিশারদ

নাম আবদুল করীম। উপাধি সাহিত্য-বিশারদ ও সাহিত্য সাগর। আব্বার নাম মুন্সী নুরুদ্দীন এবং দাদার নাম মুহাম্মদ নবী চৌধুরী। আবদুল করীমের পুরো নাম মুন্‌শী আবদুল করীম সাহিত্য-বিশারদ। তবে তিনি আবদুল করীম সাহিত্য-বিশারদ নামেই পরিচিত। এমনকি শুধু সাহিত্য-বিশারদ বললেই তাঁকেই বুঝানো হয়। তিনি ছিলেন একাধারে সংগ্রাহক, গবেষক, প্রবন্ধকার ও সম্পাদক। না, তিনি কবি বা মৌলিক কোন লেখক ছিলেন না। আর এ জন্যেই অনেকের কাছে তিনি একটু অপরিচিত। কিন্তু তাই বলে তিনি মোটেও ছোট খাটো কোন ব্যক্তি নন। তিনি আমাদের বাংলা সাহিত্য অঙ্গনের এক মহান মনীষী। যাঁকে বাঙ্গালি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যুগ যুগ ধরে স্মরণ করবে। সত্যি কথা বলতে কি পুরো বাঙ্গালি জাতি এই মহান মানুষটির কাছে ঋণী হয়ে আছেন।

আবদুল করীম ১৮৭১ সালে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার সুচক্রদণ্ডী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত কাদির রাজার অধস্তন বংশধর। তাঁর উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ হাবিলাস মল্ল কোন এক সময় চট্টগ্রামের কাছাকাছি এক দ্বীপে এসে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তাঁর নাম অনুসারে ঐ দ্বীপের নাম করণ করা হয় হাবিলাস দ্বীপ। এই হাবিলাস মল্লের অধস্তন পুরুষ আবদুল কাদির ওরফে কাদির রাজা সুচক্রদন্ডী গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁরই পৌত্র হলেন আলোচ্য আবদুল করীম সাহিত্য-বিশারদের দাদা মুহাম্মদ নবী চৌধুরী। দুঃখজনক হলেও সত্য যে আবদুল করীম দুনিয়ার আলো দেখার পূর্বে অর্থাৎ জন্মের পূর্বে তাঁর আব্বা মারা যান। ইয়াতীম আবদুল করীম দাদা দাদী মা ও চাচার আদরে লালিত পালিত হন।

আবদুল করীমের শিক্ষা জীবন শুরু হয় বাড়িতে আরবী পড়ার মধ্য দিয়ে। পরে তাঁকে নিজ গ্রাম সুচক্রন্ডীর মধ্য বঙ্গ স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়। প্রাথমিক লেখাপড়া শেষ হলে তাঁকে পটিয়া উচ্চ ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করা হয় এবং সেখান থেকে ১৮৯৩ সালে দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। এরপর তিনি চট্টগ্রাম কলেজে এফ. এ ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু শারিরীক অসুস্থতার কারণে দু'বছর ক্লাস করার পরও পরীক্ষা না দিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। মোটামুটি প্রাতিষ্ঠানিক লেখা পড়া তাঁর এখানেই শেষ।

www.pathagar.com

আবদুল করীমের কর্মজীবনের কথা বলার আগেই সবাইকে একটা শুভ সংবাদ দিতে চাই, আর তা হল তাঁর বিয়ের সংবাদ। আগেই বলেছিলাম যে তাঁর জন্মের পূর্বেই তিনি পিতৃহারা হন। অথচ দাদা-দাদী তখনো বেঁচে। তাঁর দাদা বেঁচে থাকার সুবাদে আইন অনুযায়ী তিনি পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। একারণে তাঁর বুদ্ধিমান দাদা নিজের অপর পুত্র আয়নুদ্দীন চৌধুরীর বড় মেয়ের সাথে আবদুল করীমের বিয়ে দিয়ে দেন। এ সময় আবদুল করীমের বয়স ছিল মাত্র এগারো (১১) বছর।

ছাত্র জীবন অসমাপ্ত রেখে তিনি প্রথমে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলে চাকুরী নেন। কিছুদিন এ চাকরী করার পর তিনি সীতাকুণ্ড মধ্য ইংরেজী স্কুলের অস্থায়ী প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করেন। এর কিছুদিন পর তিনি চট্টগ্রাম প্রথম সাব জজের আদালতে শিক্ষানবীশ (এপ্রেন্টিস) পদে যোগদান করেন। ১৮৯৭ সালে তাকে পটিয়ার দ্বিতীয় মুন্সেফের আদালতে বদলী করা হয়। এ সময়ে কবি নবীন চন্দ্রসেন কমিশনারের পার্সনাল এ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে চট্টগ্রাম আসেন এবং তিনি অক্ষয় চন্দ্র সরকার সম্পাদিত পূর্ণিমা' পত্রিকায় (১৩০৩-১৩০৬) অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী' শিরোনামে আঠারো পর্বে দুস্প্রাপ্য ও মূল্যবান সংগ্রহের ওপর আবদুল করীমের গবেষণা লব্ধ লেখা পড়ে মুগ্ধ হন। যে কারণে নবীনচন্দ্র সেন আবদুল করীমকে এ্যাকটিং ক্লার্ক পদে চট্টগ্রাম কমিশনার অফিসে বদলী করে আনেন। পুঁথি সংগ্রহের জন্য স্থানীয় ' জ্যোতি' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে আবদুল করীমের চাকরী চলে যায়। সাথে সাথে নবীনচন্দ্র সেনকে বদলী করা হয় কুমিল্লায়। এরপর 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত' (১৮৯৮) গ্রন্থের লেখক এবং স্কুলসমূহের (১৯০৬) সহকারী পরিদর্শক আবদুল করীম বি. এ তাঁকে নিজ অফিসে কেরানীর পদে চাকরী দেন। তিনি এই পদে একটানা আটাশ বছর চাকরীর পর ১৯৩৪ সারে অবসর গ্রহণ করেন। অবশ্য তিনি এক সময় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষার বাংলার পরীক্ষক নিযুক্ত হন; পরবর্তীতে বি. এ পরীক্ষারও পরীক্ষক নিযুক্ত হন।

আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ যখন চট্টগ্রাম আনোয়ারা মধ্য ইংরেজী স্কুলের (১৮৯৮) প্রধান শিক্ষক ছিলেন তখন তিনি বিস্তার কাজ করার সুযোগ পান। ছোট বেলা থেকেই পুঁথি সংগ্রহের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। তাই পরিণত বয়সে এসে তিনি পুঁথির পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছেন এবং দক্ষ হাতে তা সম্পাদনা করে প্রত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। জানা যায় এ সময়ে তিনি একই সাথে প্রায় ত্রিশটির মত পত্রিকায় লেখা পাঠাতেন। যেমন, পূর্ণিমা, সাহিত্য সংহতি, অর্চনা, সাহিত্য, প্রদীপ, আলো, সাহিত্য পরিষৎ, পত্রিকায় আরতি, জ্যোতি, নবনূর, ইসলাম প্রচারক, কোহিনূর ইত্যাদি।

www.pathagar.com

তিনি নিজে 'নবনুর', 'সওগাত', পূজারী', 'সাধনা', 'কোহিনূর' ইত্যাদি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর সমস্ত বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করে পুঁথি পত্র ও প্রাচীন কবি সাহিত্যিকদের অজানা সব তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ যে তিনি প্রায় ৬০০ (ছয়শত)-এর মত প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে জমা দিয়েছেন।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর সম্পাদনায় কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে – ১. রাধিকার মানভঙ্গ – নরোত্তম ঠাকুর (১৯০১); ২. বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ১ম ও ২য় সংখ্যা (১৯১৩); ৩. বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ১ম খন্ড, ১ম সংখ্যা (১৯১৪); ৪. সত্য নারায়ণের পুঁথি – কবি বল্লভ; (১৯১৫); ৫. মৃগলুব্ধ – দ্বিজ রতিদেব (১৯১৫); ৬. মৃগলুব্ধ সংবাদ – রামরাজা (১৯১৫); ৭. গঙ্গা মঙ্গল – দ্বিজমার্ধর (১৯১৬); ৮. জ্ঞান সাগর – আলী রাজা ওরফে কানু ফকীর (১৩২৪); ৯. শ্রী গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস – বাসুদেব ঘোষ (১৯১৭); ১০. সারদা মঙ্গল – মুক্তারাম সেন (১৯১৯); ১১. গোরক্ষ বিজয় – শেখ ফয়জুল্লাহ (১৯১৭) ইত্যাদি।

এছাড়া ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হকের সাথে যৌথভাবে রচিত ও প্রকাশিত 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' লেখাটি। ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে আবদুল করীম সংকলিত 'পুঁথি পরিচিতি' এবং আবদুল করীম কর্তৃক প্রদত্ত 'বাংলা পুঁথির পরিচায়িকা'ও প্রকাশ করে। 'বাংলা পুঁথির পরিচায়িকা'র ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর সম্পাদিত 'পদ্মাবতী' গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছে। সব থেকে গর্বের বিষয় হলো তিনি এ সব বিষয়ের ওপর পাঁচ শতাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

তাঁর সম্পাদনার মান এত উন্নত ছিল যে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "গ্রন্থের সম্পাদনা'– কার্যে যেরূপ কৌশল, যেরূপ সহৃদয়তা ও যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সমস্ত বাঙ্গালা কোনো, সমস্ত ভারতেও বোধহয় সচরাচর মিলে না। এক একবার মনে হয় যেন কোন জার্মান এডিটর গ্রন্থ সম্পাদনা করিয়াছেন।"

আর আশ্চার্য ক্ষিতি মোহন বলেছেন, "তিনি ব্যক্তি নহেন তিনি একটি প্রতিষ্ঠান, তাঁর 'ইসলামাবাদ' গ্রন্থ মৌলিক প্রবন্ধ রচনার সমষ্টি। এ-সব রচনা প্রাঞ্জল এবং স্বাদু গদ্যে নির্মিত। তাঁর অসাধারণ গবেষণা ব্যতীত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা সম্ভব হতো না।"

দেখা যায় তিনি বেশ কিছু প্রতিনিধিত্বশীল সাহিত্য অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেছেন, চট্টগ্রাম বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের

www.pathagar.com

অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন ১৯১৮ সালে। ঐ সমিতি ১৯৬৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক অনুষ্ঠানের মূল সভাপতির আসন অলংকৃত করেন তিনি। ২১ ও ২২ জানুয়ারী ১৯৫০ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। এ ছাড়া ১৯৫২ সালে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত পূর্ব বঙ্গ সংস্কৃত সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন তিনি।

বাল্যকাল থেকে আবদুল করীম সাহিত্য বিরাশদ পুঁথিপত্র ও সাময়িক পত্র পত্রিকা পাঠে যে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন তা তাঁর পরবর্তী জীবনে পত্র পুষ্পে সুশোভিত হয়ে উঠে। জানা যায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়াকালেই তিনি সাময়িক পত্রের নিবিষ্ট পাঠকে পরিণত হন। আর নবম শ্রেণীতে পড়াকালে তিনি ইংরেজী সাপ্তাহিক 'দি হোপ' বাংলা সাপ্তাহিক 'প্রকৃতি' ও 'অনুসন্ধান' এবং একখানি মাসিক পত্রিকার গ্রাহক হন।

যাহোক একান্ত শিশুকাল থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদকে আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন পাঠক সংগ্রাহক ও তথ্য নিষ্ঠ গবেষক হিসাবে পাই। এই মহান মনীষী ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ সালে ৮৩ বছর বয়সে চট্টগ্রামে ইন্তেকাল করেন। ◎

www.pathagar.com

মহাকবি আল্লামা ইকবাল

'আরব হামারা চীন হামারা হিন্দুস্তাঁ হামারা,
মুসলিম হ্যায় হাম, —ওতন হ্যায়
সারা জাঁহা হামারা।'

কোন কোন মানুষকে আল্লাহ্ বিশেষভাব সৃষ্টি করেন দেশ ও জাতির খেদমতের জন্য। শত ঝড়ঝঞ্ঝা বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে সেসব মানুষ তাঁদের কাজ বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করে যান। আমরা আজকে এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব ও কবি পুরুষ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

তোমরা হয়ত কোন না কোনভাবে শুনে থাকবে মহাকবি আল্লামা ইকবাল সম্পর্কে। হয়ত কথাটা এজন্য বললাম যে, বর্তমানে আমাদের দেশে কবি ইকবালকে জানার তেমন কোন সুযোগ নেই। সত্যি কথা বলতে কি এই মহান কবিকে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা হচ্ছে।

কবি ইকবাল পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোট নামক স্থানে ১৮৭৭ সালের ৯ নভেম্বর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শেখ নূর মোহাম্মদ এবং মাতার নাম ইমাম বীবী। কবির পিতা-মাতা উভয়েই অত্যন্ত দ্বীনদার ও পরহিজগার মানুষ ছিলেন। কবির পূর্ব পুরুষগণ কাশ্মীরবাসী সাপ্রু গোত্রীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা সুলতান জয়নুল আবেদীন ওরফে বুদ শাহ (১৪২১-১৪৭৩ খৃঃ)-এর রাজত্বকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর দাদা শিয়ালকোটে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং ষাট বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

কবির পিতা শেখ নূর মোহাম্মদ উচ্চ শিক্ষিত কোন মানুষ ছিলেন না কিন্তু তিনি একজন স্বনামধন্য পণ্ডিত ছিলেন। যার কারণে শামসুল উলামা সৈয়দ মীর হাসান তাঁকে (কবির পিতাকে) অশিক্ষিত দার্শনিক উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

ইকবালের জন্মের ব্যাপারে কথিত আছে যে, একদিন তার পিতা স্বপ্নে দেখলেন, আকাশচারী একটি অসম্ভব সুন্দর কবুতর তার কোলে এসে পড়ল।' পরে তিনি স্বপ্ন বিশারদের নিকট থেকে জানতে পারলেন অদূর ভবিষ্যতে তিনি একজন ভাগ্যবান পুত্রের বাপ হতে যাচ্ছেন। আরও কথিত আছে শেখ নূর মোহাম্মদের কোলে যখন সদ্য ভূমিষ্ট ইকবালকে দেয়া হয় তখন তিনি সদ্যজাত শিশু পুত্রকে

www.pathagar.com

লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'বড় হয়ে দ্বীনের খেতমত করলে বেঁচে থাক, না হলে এখনই মরে যাও।' বুঝতে পারছ তাঁর স্নেহময় পিতা তাঁর কাছ থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমতের জন্য কি আশা করেছিলেন ?

পিতা নূর মোহাম্মদ-এর ইচ্ছে ছিল পুত্রকে মাদ্রাসায় পড়ানোর কিন্তু ওস্তাদ শামসুল উলামা মীর হাসানের পরামর্শে তাঁকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করা হয়। প্রাইমারী শিক্ষা শেষ হলে তাঁকে শিয়ালকোট স্কচ মিশন স্কুলে ভর্তি করা হয়। এ স্কুল থেকে তিনি ১৮৯৩ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। স্কচ স্কুলের ছাত্র থাকাকালে তিনি একদিন দেরিতে ক্লাসে আসেন, ক্লাস টিচার তাঁর দেরিতে ক্লাসে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে বালক ইকবাল তৎক্ষণাত উত্তর দেন, 'ইকবাল (সৌভাগ্য) দেরিতে আসে স্যার।' উত্তর শুনে পণ্ডিত শিক্ষক তো 'থ'। তিনি যে শুধু উপস্থিত বুদ্ধিতে দক্ষ ছিলেন তা নয়। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন প্রচণ্ড মেধাবী। জান যায় ১৮৮৮ সালে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায়, ১৮৯১ সালে নিম্নমাধ্যমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ও ১৮৯৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক ও মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৯৩ সালে স্কচ মিশন স্কুল কলেজে উন্নীত হলে ইকবাল ঐখানে এফ. এ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৮৯৫ সালে অনুষ্ঠিত এফ. এ পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম বিভাগে পাস করেন এবং যথারীতি বৃত্তিসহ স্বর্ণপদক লাভ করেন।

১৮৯৫ সালে তিনি শিয়ালকোট থেকে লাহোর চলে আসেন এবং লাহোর সরকারী কলেজে বি. এ ভর্তি হন। এখানে একটা খবর দিয়ে রাখি, ইকবাল যখন বি. এ পড়ার জন্য পিতার নিকট অনুমতি চাইলেন তখন তাঁর পিতা কি বলেছিলেন, 'ছাত্র জীবন শেষ করবার পর অবশিষ্ট জীবন ইসলামের খিদমতে ওয়াক্‌ফ করে দিতে হবে।'

হ্যাঁ! তিনি তাতেই রাজী হয়েছিলেন। আর সত্যি সত্যিই তাঁর সারাটা জীবন ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। লাহোর সরকারী কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি টি. ডব্লিউ-এর মত ভুবন বিখ্যাত একজন সুযোগ্য শিক্ষক পান। যিনি ছিলেন আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত, দর্শনের অধ্যাপক ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক। প্রতিভাবান ইকবালকে ছাত্র হিসেবে পেয়ে আরনল্ড সাহেব তাঁকে আপন করে নিয়েছিলেন এবং মনের মত করে গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৯৭ সালে তিনি আরবী ও ইংরেজিতে সমগ্র পাঞ্জাবে প্রথম স্থান নিয়ে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যে কারণে তিনি এবার দু'টি স্বর্ণপদক লাভ করেন। এরপর ১৮৯৯ সালে কৃতিত্বের সাথে দর্শন শাস্ত্রে এম. এ পাস করেন। সাথে সাথে তিনি লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজে ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এর সামান্য কিছুদিন পরেই তিনি লাহোর সরকারী কলেজ ও ইসলামিয়া কলেজের ইংরেজি ও দর্শনশাস্ত্রের খণ্ডকালীন সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত

www.pathagar.com

হন। এ সময়ে উর্দু ভাষায় অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর সর্বপ্রথম পুস্তক রচনা করেন। তাঁর জীবন ছিল ছকে বাঁধা। এ সম্বন্ধে 'ইসলামী বিশ্বকোষ' লিখেছে, 'তিনি ভোরে উঠে ফজরের সালাত আদায় করতেন, অতঃপর উচ্চস্বরে কোরআন তিলাওয়াত করতেন। তারপর কিছুক্ষণ শরীর চর্চা করতেন এবং কিছু না খেয়ে কলেজে যেতেন। দুপুরে বাড়ি ফিরে আহার করতেন। অনেক সময় গভীর রাতে উঠে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতেন। একবার তিনি একাধারে দুই মাস এই রাত্রিকালীন সালাত আদায় করেন।'

১৯০৫ সালে তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের মানসে লণ্ডন গমন করেন। পথিমধ্যে তিনি খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া, সূফী কবি আমীর খসরু ও মহাকবি গালিবের মাযার জিয়ারত করেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি দর্শন শাস্ত্রে এম. এ ডিগ্রি লাভ করেন। এ সময় তিনি শিক্ষক হিসেবে পান বিশ্ব খ্যাত দার্শনিক ডঃ এম সি ট্যাগার্টকে। এরপর তিনি পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণে বের হন। শেষে জার্মানীর মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারস্যের দর্শন শাস্ত্র বিষয়ক সন্দর্ভ লিখে ১৯০৭ সালে পি. এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন। এরপরের বছর ১৯০৮ সালে Lincoln Inn হতে ব্যারিস্টারী পাস করেন। এ সময় তাঁর প্রিয় শিক্ষক স্যার আর্নল্ড লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বিশেষ কারণে কয়েক মাসের ছুটিতে গেলে ইকবাল ৬ মাসের জন্য তাঁর স্থানে আরবীর অস্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৯০৮ সালের ২৭ জুলাই তিনি দেশে ফিরে এলে লাহোরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করেন। তিনি লাহোর ফিরে পূর্বপদে বহাল হন এবং সরকারের অনুমতিক্রমে আইন ব্যবসা শুরু করেন। অবশ্য দেড় বছর পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্থায়ীভাবে আইন ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন। তবে একটা কথা তোমাদের জেনে রাখা দরকার যে, তিনি কখনই মাসিক খরচের পরিমাণ টাকা রোজগারের পর কোনও মোকদ্দমা গ্রহণ করতেন না। আরও একটা কথা, তিনি যদি বুঝতেন কোন মোকদ্দমায় মক্কেলের তেমন উপকার করতে পারবেন না তা'হলেও তিনি সে কেস গ্রহণ করতেন না। শেষ জীবন পর্যন্ত এভাবে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

ছাত্রাবস্থায় ১৮৯৬ সালে সিয়ালকোটের এক কবিতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে তাঁর কবি প্রতিভার বিকাশ লাভ করতে শুরু করে। এরপর তিনি বেশ কিছু কবিতা লিখে হায়দারাবাদের প্রখ্যাত কবি দাগের নিকট পাঠিয়ে দেন সংশোধনের জন্য। কবি দাগ কিশোর কবির এ কবিতাগুলি পেয়ে মনোযোগ সহকারে পড়েন ও চমৎকার একটা মন্তব্য লিখে পাঠান। কবি দাগ লিখেছিলেন, 'এ কবিতাগুলো সংশোধন করার কোন দরকার নেই এগুলো কবির স্বচ্ছ মনের

www.pathagar.com

সার্থক, সুন্দর ও অনবদ্য ভাব প্রকাশের পরিচয় দিচ্ছে।' কবি ইকবাল এ চিঠি পেয়ে তো আনন্দে লাফালাফি শুরু করে দিলেন। তারপর থেকে চললো তাঁর বিরামহীন কাব্যসাধনা। এরপর ১৯০০ সালে তিনি লাহোরে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমানে হিমায়েতে ইসলাম-এর বার্ষিক সাধারণ সভায় জীবনের প্রথম জনসমক্ষে তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'নালা ইয়াতীম' বা অনাথের আর্তনাদ পাঠ করেন। কবিতাটি পড়ার পর চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে যায়। মানে কবিতাটি এত জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, তাৎক্ষণিকভাবে কবিতাটি ছাপানো হয় এবং এর প্রতিটি কপি সে সময়ে চার টাকা দামে বিক্রি হয়। বিক্রয়লব্ধ প্রচুর পরিমাণ টাকা ইয়াতিমদের সাহায্যার্থে চাঁদা হিসেবে গৃহীত হয়। ১৯০১ সালে তিনি ছোটদের জন্য লেখেন, মাকড়সা ও মাছি, পর্বত ও কাঠ বিড়ালি, শিশুর প্রার্থনা, সহানুভূতি, পাখীর নালিশ, মায়ের স্বপ্ন প্রভৃতি কবিতা।

এরপর তিনি দু'হাতে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু ছিল, 'স্বদেশ প্রেম, মুসলিম উম্মাহর প্রতি মমত্ববোধ, ইসলামের শাশ্বত আদর্শে তাওহীদভিত্তিক বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, জাতির উত্থান-পতন, দলীয় কলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরসন প্রভৃতি বিষয় কবিতায় স্থান পেতো। ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে তিনি বেলালী সুরে আহ্বান জানাতেন ক্লান্তিহীনভাবে। স্বকীয় আদর্শের সন্ধানে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে তোলাই তাঁর লক্ষ্য ছিল।'

তাঁর কাব্যে এ ধরনের চিরন্তন আবেদন থাকার কারণে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হন। নানামুখি প্রতিভার অধিকারী এ মহান ব্যক্তিত্ব তাই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সর্বমহল থেকে অকুণ্ঠ সম্মান অর্জন করেন। এ প্রসংগে তোমাদের অবগতির জন্য মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের একজন হিন্দু অধ্যাপকের মত তুলে ধরছি। তিনি বলেছিলেন, 'মুসলমানগণ ইকবালকে লক্ষ্যবার তাদের সম্পদ বলে দাবি করতে পারেন। কিন্তু তিনি কোন ধর্ম বা শ্রেণীবিশেষের সম্পদ নন—তিনি একন্তভাবে আমাদেরও।'

১৯০১ সালে 'হিমালাহ্' নামক কবিতাটি তৎকালীন সময়ের উর্দু ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'মাখযানে' ছাপা হয়। এটিই পত্রিকায় প্রকাশিত কবির প্রথম কবিতা। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে তিনি এ সময় অনেকগুলো পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। ১৯০৩ সালে লাহোর থেকে অর্থনীতির ওপর তাঁর প্রথম পুস্তক 'আল-ইলমুল ইকতেসাদ' প্রকাশিত হয়।

১৯২৪ সালে 'বাঙ্গেদারা' বা ঘন্টাধ্বনি নামক তাঁর বিখ্যাত কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত এ গ্রন্থটির বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আসরার-ই-খুদী' বা ব্যক্তিত্বের গূঢ় রহস্য। এ

www.pathagar.com

কাব্য গ্রন্থটি ১৯২০ সালে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেন ডঃ আর. এ নিকোলসন। সাথে সাথে সমগ্র পশ্চিমা বিশ্বে মহাকবি ও বিশ্বকবি আল্লামা ইকবালের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৫ সালে 'আসরার-ই-খুদী' বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি বিশ্বের বহুভাষায় অনূদিত হয়েছে ও প্রকাশিত হয়েছে।

১৯১১ও ১৯১২ সালে জনসমক্ষে পঠিত তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কবিতা 'শিকওয়াহ' বা অভিযোগ ও 'জওয়াব-ই-শিকওয়াহ' বা অভিযোগের জবাব উর্দু ভাষায় রচিত। এ দীর্ঘ দু'টি কবিতার কাব্যগ্রন্থ দু'টির বাংলা ভাষায় একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয় ফারসী ভাষায় রচিত 'পায়াম-ই-মাশরিক' প্রাচ্যের বাণী কাব্যগ্রন্থটি। গ্রন্থটি আরবী, ইংরেজি, তুর্কী, জার্মান ও রুশ ভাষায় অনূদিত হয়। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয় ফারসী ভাষায় 'রামূয-ই-বেখুদী' বা আত্মবিলোপের গুঢ়তত্ত্ব কাব্যগ্রন্থটি। মূলত এ গ্রন্থটি 'আসরারে খুদী'র দ্বিতীয়াংশ। শুনলে আশ্চর্য হতে হয় যে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত এই গ্রন্থটির ৮৪তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তার 'বালে জিবরীল' বা জিবরাঈলের ডানা ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। এটি উর্দু ভাষায় রচিত। 'দরবারে কালীম' বা মূসার লাঠির আঘাত কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। উর্দু ভাষায় রচিত এ কাব্যগ্রন্থটি আরবী ও রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েও প্রকাশিত হয়।

এর আগে ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'যাবুরে আজম' বা প্রাচ্যের ধর্ম সংগীত কাব্যগ্রন্থটি। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয় ফারসী ভাষায় রচিত 'জাবীদ নামা' বা অমর লিপি কাব্যগ্রন্থটি। এমনিভাবে একের পর এক তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সম্ভবত তিনি প্রাচ্যের সেই ভাগ্যবান কবি ব্যক্তিত্ব যার রচনা এত ব্যাপকভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। সত্যিই যদি বিশ্বকবি বিশেষণে কাউকে বিশেষিত করতেই হয় তবে সে সম্মানের অধিকারী নিঃসন্দেহে কবি আল্লামা ইকবাল। কবি নিজেও ছিলেন বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত। তিনি উর্দু, ফারসী, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় লেখনি চালিয়েছেন।

কবি The Development of Metaphisics in Persia বা 'প্রজ্ঞান চর্চায় ইরান' এই বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯০৮ সালে লণ্ডন থেকে এ থিসিস প্রকাশিত হয়।

এতোক্ষণ তাঁকে কবি হিসেবে পরিচয় করালাম। আসলে তিনি শুধু কবিই ছিলেন না। তিনি সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ, প্রখ্যাত দার্শনিক আইনজ্ঞ প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত ছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি পাঞ্জাব আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

www.pathagar.com

১৯৩০ সালে নির্বাচিত হন মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে। ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে তিনি বিলেত গমন করেন 'গোল টেবিলে' যোগদানের জন্য। এই বৈঠকে তিনি ভারতীয় মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন দাবি দাওয়া পেশ করেন। অবশ্য এর আগে মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে ১৯৩০ সালের ২৯ ডিসেম্বর সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমি চাই যে, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান একটি রাষ্ট্রে পরিণত হউক। পৃথিবীর এই অংশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে হউক বা বাহিরে হউক-অন্ততপক্ষে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে একটি মুসলিম রাষ্ট্র সংগঠনই আমার মতে মুসলমানদের শেষ নিয়তি।' এই মত অনুযায়ীই পরবর্তীকালে পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। এ জন্য তাকে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা ও রূপকার বলা হয়। অবশ্য তিনি ১৯৩৭ সালের ২১ জুন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমি যেভাবে প্রস্তাব করেছি সেভাবে পুনর্গঠিত মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশসমূহের একটি পৃথক যুক্তরাষ্ট্রই হল একমাত্র উপায়, যদ্বারা একটি শান্তিপূর্ণ ভারত গড়ে উঠতে পারে এবং সাথে সাথে অমুসলিম আধিপত্য হতে মুসলিম সম্প্রদায়কে রক্ষা করা যেতে পারে। উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং বাংলার মুসলমানদেরকে কেন একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে স্বীকৃতি দেয়া হবে না– যাতে তারা ভারতের এবং ভারতের বাইরের অন্যান্য জাতিসমূহের ন্যায় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পেতে পারে ?' এ উদ্ধৃতিতে তিনি যে বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্যও একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয়ার কথা বলেছিলেন তা নিশ্চয় বুঝা যায়। মূলত আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বও তাঁরই চিন্তার ফসল। অথচ এ মহান ব্যক্তিত্বকে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর থেকে অস্বীকার করার চেষ্টা করা হচ্ছে, একথা আগেই বলেছি। তাকে অস্বীকার করা হচ্ছে যে কারণে তিনি নাকি পাকিস্তানপন্থী ছিলেন। অথচ তিনি পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ারও বেশ আগে ১৯৩৮ সালে ২১ এপ্রিল ইন্তেকাল করেন। আশা করি বুঝতে মোটেই কষ্ট হচ্ছে না যে, আমরা এ মহান ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করে কি পরিমাণ মূর্খতায় ও ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত । সত্যি কথা আমাদের দেশের তথাকথিত কিছু অনুদার বুদ্ধিজীবী এর জন্য দায়ী।

উপমহাদেশের এই প্রখ্যাত দার্শনিক কবি অসম্ভব দেশপ্রেমিক একজন মানুষ ছিলেন। লেখার শুরুতেই যে কবিতাটির উদ্ধৃতি দিয়েছি তার কাব্যানুবাদ এ রকমের—

'আরব আমার, ভারত আমার, চীনও আমার-
নহে তো পর-

মুসলিম আমি, –জাহান জুড়িয়া
ছড়ানো রয়েছে আমার ঘর।'

দুঃখের বিষয় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সচেতনভাবে এ কবিকে বর্জন করা হয়। তার প্রমাণ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর-ইকবাল হলের নাম পরিবর্তন করে জহুরুল হক হল নামকরণ করা, পাঠ্য তালিকা থেকে তাঁর রচনা ও জীবনী বাদ দেয়া।

আমরা আশা করবো এখন থেকে নতুন করে আবার আমরা ইকবাল চর্চায় ফিরে যাব। কবিকে তাঁর প্রকৃত সম্মানে সম্মানিত করবো। দেশের সব শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকে তাঁর রচনা অন্তর্ভুক্ত হওয়া এ জাতির কল্যাণের জন্যই অবশ্য প্রয়োজন, সে দিকটা দেখার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান রইলো। ◎

www.pathagar.com

ইসমাইল হোসেন সিরাজী

"আর ঘুমিও না নয়ন মেলিয়া
উঠরে মোসলেম উঠরে জাগিয়া
আলস্য জড়তা পায়েতে ঠেলিয়া
পুত বিভু নাম স্মরণ করি।"

সিরাজগঞ্জ শহরের এক ছোট্ট কামরায় বসে লিখে চলেছেন এক তরুণ তার আপন কওমকে জাগিয়ে তোলার জন্য। লিখে চলেছেন বৃটিশ বেনিয়াদের এদেশ থেকে চিরতরে উৎখাতের জন্য। এই বেনিয়া গোষ্ঠী সমগ্র ভারত উপমাহদেশ মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। ক্ষোভে-দুঃখে মুসলমানরা ইংরেজদের প্রবর্তিত অনেক কিছুই ত্যাগ করে। এমনকি ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ থেকেও নিজেদেরকে সরিয়ে রাখে। অপরদিকে হিন্দুরা এ সুযোগ গ্রহণ করে শিক্ষা-দিক্ষায় মুসলমানদের থেকে তারা এগিয়ে যায়। মুসলমানরা হয়ে পড়ে পঙ্গু-কি শিক্ষা-দিক্ষায়, কি সম্পদ-বৈভবে। ঠিক এ সময়েই কলম তুলে নেন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী। ১৮৮০ সালের ১৩ জুলাই তারিখে তিনি পাবনা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বার নাম সৈয়দ আবদুল করীম এবং মাতার নাম নূরজাহান খানম। তারা উভয়েই ছিলেন অত্যন্ত দ্বীনদার ও পরহেজগার মানুষ।

শিশু ইসমাইল হোসেনের লেখাপড়ার প্রথম সবক দেন তাঁর মা নূরজাহান খানম। নূরজাহান খানম তাঁর শিশু পুত্রকে প্রথমেই কোরআন শিক্ষা দেন। কোরআন শিক্ষা শেষ হলে তাঁকে মধ্য ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করা হয়। মেধাবী ইসমাইল হোসেন অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে সিরাজগঞ্জের বি এল উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। কিন্তু মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্রের কারণে এ সম্ভাবনাময় তরুণ লেখাপড়ার ক্ষেত্রে আর অগ্রসর হতে পারেন নি। তাছাড়া স্বদেশের পরাধীনতা, সমগ্র মুসলিম জাহানের দুর্দশার জন্য বেদনা বোধ থেকে সৃষ্টি উৎকণ্ঠাও তাঁকে স্কুলের চার দেয়ালের মধ্যে বসে থাকতে দেয়নি। তোমরা জানলে আশ্চর্য হবে যে, তিনি এ সময়ে নির্যাতিত অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও পদদলিত মুসলিম জাতির জন্য এতই বেদনাবিধুর, এতই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন যে, মাত্র ১৬ বছর বয়েসেই লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে তুরস্কের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এ যাত্রা তিনি তুরস্কে যেতে পারেন নি ঠিক কিন্তু সেই যে মুসলিম

www.pathagar.com

জাহানের কল্যাণের মানসে ঘর থেকে বের হলেন আর কখনই সুবোধ বালকের মত ঘরে বসে থাকেন নি। অবশ্য তিনি পরবর্তীতে তাঁর বাল্যকালের স্বপ্নের তুরস্কে গিয়েছিলেন তা অনেক পরের কথা।

ছেলেবেলা থেকেই শিরাজী ইতিহাস পাঠক ছিলেন। তাঁর লেখাপড়ার পরিধি ছিল অনেক বিস্তৃত। পড়াশোনা করতে গিয়ে তিনি এ বাল্য বয়সেই জানতে পারেন প্রখ্যাত সংস্কারক প্যান ইসলামবাদের প্রবক্তা সৈয়দ জামাল উদ্দিন আফগানীর কথা,জানতে পারেন স্যার সৈয়দ আহমদের কথা। এ দু'জন মনীষীর জীবনাচার তাঁর ওপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ করে জামাল উদ্দীন আফগানীর চিন্তা ও আদর্শের দ্বারা তিনি দারুনভাবে প্রভাবিত হন। দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে উদ্ধার ও মুসলিম জাতিকে তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য শিরাজী এ সময়ে 'অনল প্রবাহ' কাব্য রচনা শুরু করেন।

ঠিক এ সময়ে একটি ঘটনায় শিরাজীকে অনেক দূর এগিয়ে দেয়। এটা ১৮৯৯ সালের কথা। তখন তার বয়স ১৮-১৯ বছর। সিরাজগঞ্জের এক জনসভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত হন বংগ বিখ্যাত বাগ্মী ও ইসলাম প্রচারক মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা। ইসমাইল হোসেন শিরাজী সৌভাগ্যক্রমে এ সভায় তাঁর 'অনল প্রবাহ' কবিতাটি পড়ার সুযোগ পান–সেই সূত্রে পরিচয় হয় মুন্‌সী মেহেরউল্লার সাথে। উদার হৃদয় মুন্সী মেহেরউল্লা শিরাজীর মেধায় মুগ্ধ হন এবং 'অনল প্রবাহ' কাব্য গ্রন্থটি নিজ খরচে যশোর থেকে প্রকাশ করেন। এতে করে শিরাজী এত উৎসাহিত হন যে, জীবনে কোন দিন সে কথা ভোলেন নি। তাইতো তিনি মুন্‌সী মেহেরউল্লার মৃত্যু সংবাদে তাঁর 'শোকোচ্ছ্বাস' কবিতায় লিখেছিলেন–

যাঁর সাধনায় প্রতিভা প্রভায়
নতুন জীবন ঊষা
উদিল গগনে মধুর লগনে
পরিয়া কুসুম ভূষা।
গেল যে রতন
হায় কি কখন
মিলিবে সমাজে আর?
মধ্যাহ্ন তপন হইল মগন,
বিশ্বময় অন্ধকার।

ইসমাইল হোসেন শিরাজীর সব থেকে পরিচিত কাব্যগ্রন্থ্ হল 'অনল প্রবাহ'। এটি ১৮৯৯ সালে মুন্‌সী মেহেরউল্লা প্রথম প্রকাশ করেন। একথা আগেই বলেছি। পুস্তিকাটি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে, ১৯০০ সালে আরো কিছু কবিতা নিয়ে কাব্যগ্রন্থটি আবার প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯০৮ সালে এটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ

www.pathagar.com

হিসেবে প্রকাশিত হয়। আর এ সময়ই 'অনল প্রবাহ' ও তার লেখক বৃটিশ রাজশক্তির আক্রমণের শিকার হন। 'অনল প্রবাহ' বাজেয়াপ্ত হয় এবং লেখকের দু'বছর কারাদণ্ড হয়। তোমরা শুনলে গর্বানুভাব করবে যে, শিরাজীই প্রথম কবি যার কাব্যগ্রন্থ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ করা হয় এবং তিনিই রাজদ্রোহীতার অভিযোগে কারাদণ্ড ভোগকারী উপমহাদেশের প্রথম সাহিত্যিক।

শিরাজীর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ হল উচ্ছ্বাস, উৎসব, উদ্বোধন কাব্য, মহাশিক্ষা কাব্য স্পেন বিজয় কাব্য, প্রেমাঞ্জলী (গীতিকাব্য), সঙ্গীত সঞ্জীবনী ইত্যাদি।

শিরাজী সাহেব বেশ কিছু উপন্যাসও লিখেছেন। অবশ্য উপন্যাস লিখেছেন তিনি একান্ত বাধ্য হয়েই-ঐ সময়ে হিন্দু কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিকরা লেখার ভেতরে মুসলমানদের আক্রমণ করে লিখত। বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে এক মুসলিম বিদ্বেষী ঔপন্যাসিক ছিলেন; তিনি তার লেখায় সুচিন্তিতভাবে মুসলমানদেরকে হেয় করার চেষ্টা করতেন। ইসমাইল হোসেন শিরাজী এ সমস্ত কুৎসিৎ লেখার জবাব দিতে গিয়েই উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে তারাবাই, ফিরোজা বেগম, নুরুদ্দীন, রায়নন্দিনী ও বংকিম দুহিতা।

তোমরা হয়তো ভাবছো, না জানি তিনি তাঁর উপন্যাসে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কি লেখাই না লিখেছেন। আসলে তোমাদের এ ধারণা মোটেই সত্য নয়; তিনি উপন্যাসগুলির ভেতর কোথাও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেননি। মূল কথা হল কোন প্রকৃত মুসলমানই কাউকে আক্রমণ করে কথা বলে না। আর তিনি তো সত্যিকার অর্থেই একজন প্রকৃত মুসলমান। ইসমাইল হোসেন শিরাজীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হল 'রায় নন্দিনী'।

তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধের বইগুলি হল, স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা, আদব-কায়দা শিক্ষা, তুর্কী নারী জীবন, সুচিন্তা, স্ত্রীশিক্ষা ও স্বজাতি প্রেম। স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা ও আদব-কায়দা শিক্ষা তোমাদের মত ছোটদের জন্যই লেখা। এছাড়াও তাঁর আরো কিছু বইপত্র রয়েছে।

ইসমাইল হোসেন শিরাজী শুধু কবি সাহিত্যিকই ছিলেন না তিনি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বক্তাও ছিলেন। ১৯০৩ সালে চব্বিশ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেন। এর ৩ বছর পর ১৯০৬ সালে 'অনল প্রবাহ' কাব্যের জন্য রাজদ্রোহীতার অভিযোগে জেলে যান। ১৯১২ সালে কারামুক্ত হন এবং জেল থেকে বের হয়েই মেডিকেল মিশনের সদস্য হিসেবে তুরস্কে চলে যান।

মাত্র ৫২ বছর বয়সে ১৯৩১ সালের ১৭ জুলাই দুরারোগ্য পৃষ্ঠব্রণ রোগে আক্রান্ত হয়ে মুসলিম বিশ্বের এই মহান পুরুষ ইন্তেকাল করেন। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি সর্বপ্রকার অনাচার, কদাচার, কুসংস্কার, অন্যায় ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সিংহের মত লড়ে গেছেন। না কোথাও কোন কারণে তিনি মাথা নত করেন নি। ◎

www.pathagar.com

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ একটি নাম, একটি ইতিহাস, একটি শতাব্দী। বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ, গবেষক, বহুভাষাবিদ পণ্ডিত এবং কামিল সূফী। তিনি ১০ জুলাই ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে মুতাবিক ২৭ আষাঢ়, বাংলা ১২৯২ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলায় বশিরহাট মহকুমার পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে মুন্শী মফিজ উদ্দীন আহমদ ও বেগম হরুন্নিসা। আকীকার সময় তাঁর নাম রাখা হয়েছিল মুহম্মদ ইব্রাহীম। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি ডাক নামেই পরিচিত হন।

গ্রামের মকতব থেকে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। এরপর ১৯০৪ খৃস্টাব্দে হাওড়া জিলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯০৬ খৃস্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ. এ। ঐ ১৯০৮ খৃস্টাব্দে বি. এ পরীক্ষা দিয়ে অসুস্থকার কারণে অকৃতকার্য হন। এই সময় তিনি যশোর জিলা স্কুলের সহকারী শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। পরে ১৯১০ খৃস্টাব্দে কলকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি. এ. পাশ করেন। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রাহ্মণ্যবাদী গোড়া পণ্ডিত সংস্কৃত পড়তে বাঁধার সৃষ্টি করলে একান্ত বাধ্য হয়েই ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ১৯১২ খৃস্টাব্দে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে কৃতিত্বের সাথে এম. এ. পাশ করেন। ঐ বিভাগে তিনি ছিলেন প্রথম এবং একমাত্র ছাত্র। ১৯১৪ খৃস্টাব্দে তিনি বি. এল. ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯০৮ খৃস্টাব্দে যশোর জিলা স্কুলের শিক্ষাকতা দিয়ে তার কর্মজীবন শুরু হলেও তিনি পুনরায় ছাত্র জীবনে ফিরে যান এবং ১৯১৪ খৃস্টাব্দে বি. এল, ডিগ্রী লাভ করার পর বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারক মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর অনুরোধে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯১৯ খৃস্টাব্দে তিনি সহকারী গবেষক হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এর দু'বছর পর ১৯২১ খৃস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। এ সময়ে তিনি বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন এবং ১৯২৫ খৃস্টাব্দে গৌড়ী প্রাকৃত বা সংস্কৃত ভাষা নয় বরং ভারতীয় আর্যদের অতি প্রাচীন কথ্য ভাষা থেকে বাংলার উৎপত্তি হয়েছে বলে প্রমাণ করেন। ১৯২৬ খৃস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় তিনি ইউরোপ গমন করেন। এ সময়ে তিনি প্যারিসের সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, বৌদ্ধ সংস্কৃতি বৈদিক ভাষা, তিব্বতী ও প্রাচীন পারসিক ভাষা এবং জার্মানিতে প্রাচীন সোতনী প্রাকৃত ও বৈদিক ভাষা শিক্ষা করেন।

www.pathagar.com

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালে তিনি ১৯২৮ খৃস্টাব্দে অপভ্রংশ ভাষা তিব্বতী ও বাংলার বৌদ্ধ ধর্ম ও দোঁহা মিসতিক বা মর্মবাদীর গান সম্পর্কে ফরাসী ভাষায় মৌলিক গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তিনিই সেই সৌভাগ্যবান ভারতীয় মুসলমান যিনি প্রথম এ ডিগ্রীটি পেলেন। এরপর তিনি দেশে ফিরে আসেন– এবং ১৯২৮ খৃস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। পরে ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ পৃথক হওয়ার পর বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত এ দায়িত্ব অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ঐ ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে তিনি বগুড়ার আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯৪৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৮ খৃস্টাব্দে পুনরায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অতিরিক্ত অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। এ সময়ে তিনি বাংলা ও কলা বিভাগের ডীন নিযুক্ত হন। ১৫ নভেম্বর ১৯৫৪ খৃস্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসী ভাষার খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৫৫ খৃস্টাব্দে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৫৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৯ খৃস্টাব্দে তিনি করাচীর উর্দু উন্নয়ন বোর্ড এবং ১৯৬০ খৃস্টাব্দে ঢাকার বাংলা একাডেমীতে যোগদান করেন। এ সময়ে তিনি উর্দু উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষে উর্দু সংকলনে সাহায্যে করেন এবং প্রধান সম্পাদক হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (যেটা বর্তমানে বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান হিসাবে প্রকাশিত) দায়িত্ব পালন করেন। ঐ একই সময়ে সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যা ১৯৮২ খৃস্টাব্দে দুই খণ্ডে সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ নামে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

১৯২০ খৃস্টাব্দে তাঁর সম্পাদনায় 'আঙ্গুর' নামে একটি শিশু পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকে, যেটি বাংলা ভাষায় মুসলিম সম্পাদিত প্রথম শিশু পত্রিকা। ১৯২৩ খৃস্টাব্দে ইংরেজী মাসিক পত্রিকা দি-পীস, ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, মাসিক বঙ্গভূমি, ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে পাক্ষিক তকবীর প্রকাশ করেন।

আজীবন সাহিত্য সাধনার জন্য তাঁকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে (Pride of Performance) পদক ও দশহাজার টাকা পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়। ১৯৬৭ খৃস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে প্রফেসর ইমেরিটাস পদ এবং ঐ ১৯৬৭ খৃস্টাব্দে ফরাসী সরকার তাঁকে নাইট অব দি অরডার্স অব আর্টস অ্যাণ্ড লেটার্স পদক প্রদান করেন। ১৯৬৯ খৃস্টাব্দে পাকিস্তান সরকার তাঁকে মরণোত্তর হিলাল-ই-ইমতিয়াজ খেতাব প্রদান করে। ১৯৭৭ খৃস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানজনক মরণোত্তর ডি, লিট উপাধি দেয়। ১৯৮০ খৃস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে

www.pathagar.com

মরণোত্তর স্বাধীনতা পদক প্রদান করে। তিনি আদমজী, দাউদ প্রভৃতি সাহিত্য পুরস্কার কমিটির স্থায়ী চেয়ারম্যান পদটি অলংকৃত করেন।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভাপতি, সম্পাদক, স্থায়ী সদস্য, নির্বাহী সদস্যের মত গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ অলংকৃত করেন।

তিনি প্রাকৃত, পালি, সংস্কৃত, আসামী, হিন্দি, উর্দু, উড়িয়া, মারাঠী, মৈথিলী, পাঞ্জাবী, সিংহলী, সিকিমী, তিব্বতী, আরবী, ফারসী, হিব্রু, ইংরেজী, জার্মান ও ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। বাংলা যে সংস্কৃত ভাষা থেকে জন্ম নেয়নি সেকথা তিনিই প্রমাণ করেন। তিনিই বলেন, "বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা নহে; বরং দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়া।" তাঁর রচিত ও অনূদিত গ্রন্থাবলী হল– (১) সিদ্ধা কানুপার গীত ও দোঁহা (১৯২৬), (২) Les sons du Bengalie (১৯২৮) (৩) ভাষা ও সাহিত্য (১৯৩১) (৪) রকমরি (১৯৩১) (৫) বাংলা ব্যাকরণ (১৯৩৭) (৬) দীওয়ান-ই-হাফিজ (১৯৩৮) (৭) অমিয় বাণী শতক (১৯৪০) (৮) রুবাইআত-ই-উমর খৈয়্যাম (১৯৪২) (৯) শিকওয়াহ ও জওয়াবই-শিকওয়াহ (১৯৪২) (১০) ইকবাল (১৯৪৫) (১১) পদ্মাবতী (১৯৪৬) (১২) বাইয়াত নামা (১৯৪৯৮) (১৩) প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষনবী (১৯৫২), (১৪) আমাদের সমস্যা (১৯৫৩) , (১৫) বিদ্যাপতি শতক (১৯৫৪), (১৬) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৫৭), (১৭) বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৫৯), (১৮) বৌদ্ধ মর্মবাদীর গান (১৯৬০), (১৯) কুরআন প্রসঙ্গ (১৯৬২), (২০) ছোটদের রসুলুল্লাহ (১৯৬২), (২১) ইসলাম প্রসঙ্গ (১৯৬৩), (২২) কুরআন শরীফ (১৯৬৩), (২৩) অমর কাব্য (১৯৬৩), (২৪) বুখারী শরীফ (১৯৬৩), (২৫) বাংলা সাহিত্যের কথা (২ খণ্ড; ১৯৫৩ ঃ ১৯৬৫) (২৬)ট্রাডিশনাল কালচার ইন ইস্ট পাকিস্তান (১৯৬৩), (২৭) সেকালের রূপকথা (১৯৬৫)।

তাঁর সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা হল– (১) আঙ্গুর (শিশু-পত্রিকা, ১৯১০), (২) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে পত্রিকা (যুগ্ম সম্পাদক, মোজাম্মেল হকের সাথে, ১৯১১), (৩) মাসিক আল ইসলাম (সহ সম্পাদক, ১৯১৫), (৪) The peace (১৯২২) ও (৫) মাসিক বঙ্গভূমি (১৩৩৭)। এছাড়া তিনি স্কুল মাদরাসার কোমলমতি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য রচনা করেছেন অনেকগুলো পাঠ্য পুস্তক।

এই চলন্ত বিশ্বকোষ বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ব্যক্তিটি ছিলেন পুরামাত্রায় ইসলামী শরীয়তের পাবন্দ। মুমিনের গুণাবলীগুলি তিনি তাঁর জীবনে ধারণ করতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন ফুরফুরা শরীফের পীর মুজাদ্দিদে য্যামান হযরত মওলানা শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.)-র খলীফা। ১৩ই জুলাই ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে এই মহান মনীষী ৮৪ বছর বয়সে ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। মরহুমের লাশ তাঁরই নামে নামকরণকৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের পাশে ঐতিহাসিক মূসা মসজিদ প্রাঙ্গনে দাফন করা হয়। ◎

www.pathagar.com

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা ও চর্চার একটা গঠনমূলক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৭ –১৯৯১), মোজাম্মেল হক (১৮৫০ – ১৯৬১), কায়কোবাদ (১৮৫৮ – ১৯৫১) যে ধারার সূচনা করেছিলেন পরবর্তীতে মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা (১৮৬১ – ১৯০৭), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৭৯ – ১৯৩১), শেখ ফজলল করীম (১৮৮২ – ১৯৩০), শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য–রত্ন (১৮৯১ – ১৯৬২) প্রমুখ কবি, সাহিত্যিক, সংগ্রামীগণ তা অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে এগিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের তুলনায় অনগ্রসর মুসলমানদের স্বরূপ সন্ধান, স্বাতন্ত্র্য নির্মাণ ও তাদের জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করতে। এ ক্ষেত্রে তারা সব থেকে বেশি অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন মুসলিম জাতীয় জাগরণের পথিকৃত মুন্‌সী মেহেরউল্লার নিকট থেকে। মুন্‌সী মেহেরউল্লা বুঝতে পেরেছিলেন পরাধীন দেশে বৈরী শাসনাধীনে মুসলমান সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজন তাদের মধ্যে নব জাগরণের। আর এ নবজাগরণ সম্ভব করার জন্য তিনি নিজে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, বক্তৃতা, বিবৃতি, লেখালেখির সাথে সাথে গড়ে তুলেছিলেন একটি সাহিত্যিক সম্প্রদায়।

> *"শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ছিলেন সেই সাহিত্যিক সম্প্রদায়েরই একজন। তাঁর জীবন সাধনার আদর্শ ও লক্ষ্য ছিলো বাঙালী মুসলমানের জন্য সম্মানজনক ও শ্রদ্ধাশীল আত্মপরিচয় নির্মাণে সহায়তা করা। ইসলামী ইতিহাস- ঐতিহ্য-ভিত্তিক নবজাগরণমূলক কাব্য রচনা, ভারতবর্ষের মুসলমানদের গৌরবময় অতীত অধ্যায় ও প্রেরণা প্রদায়ক ইতিহাস গ্রন্থ রচনা, ধর্মীয় চেতনা ও মননশীলতা বিকাশে 'সহায়ক সমৃদ্ধশালী বিদেশী সারাবান সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ এবং দেশের ভবিষ্যত নাগরিকদের চরিত-মানস গঠন উপযোগী শিশুতোষ সাহিত্য রচনার মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের মধ্যে একটি নব চেতনা জাগৃতির প্রত্যাশী ছিলেন। প্রায় অর্ধশতাব্দী কালব্যাপী শিক্ষকতা জীবনের পাশাপাশি তাঁর সৃজনশীল সাহিত্য সাধনার মধ্যে সংকীর্ণতা রহিত মুক্তবুদ্ধি সঞ্জাত সম্প্রদায়গত সমৃদ্ধি কামনা ও সমাজ হিতৈষণার পরিচয় পাওয়া যায়।"*
> *(শেখ হবিবর রহমান– মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, পৃ. ৯)*

www.pathagar.com

শেখ হবিবর রহমান নিজের সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থের ১০৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

"আমার সাহিত্য বরাবর মোল্লা ধরনের; এই জন্য ইহা অনেকের নিকট উপেক্ষিত। নিয়ামত, আবেহায়াত ইত্যাদি ধরনের পুস্তকের নাম বোধ হয় মুসলমান সমাজে আমিই সর্বপ্রথম রাখিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আমার বিবিধ পুস্তকে আরবী, ফারসী শব্দের ব্যবহার এত অধিক যে, আমাদের মধ্যে আর কেহই তত অধিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। জাতীয়ভাবে জাতীয় শব্দের সংমিশ্রণে জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি আমার জীবনের প্রধান একটি সাধনা।"

১৮৯১ সালে যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার (বর্তমান জেলা) অন্তর্গত শালিখা থানার ঘোষগাতি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ দেরাজতুল্লাহ এবং দাদার নাম শেখ হেরাজতুল্লাহ। জানা যায় আরব দেশ হতে তাঁর পূর্ব পুরুষ এদেশে এসেছিলেন এবং ঘোষগাতি গ্রামে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

শেখ হবিবর রহমানরা দু'ভাই ছিলেন। তাঁর ছোট ভাই শেখ ফজলর রহমানও একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শিক্ষকতা ও ধর্মপ্রচার করে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিশেষ করে 'পুলুম আঞ্জুমানে হেমায়তল ইসলাম' নামক ধর্মীয় সামাজিক সংগঠনের সম্পাদক ও 'আলমগীর লাইব্রেরীর পক্ষে বড় ভাই শেখ হাবিবর রহমানের বেশ কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

শেখ হবিবর রহমানের লেখাপড়া গ্রামের পাঠশালায় শুরু হয়। পরে পুলুম প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ প্রাথমিক পাঠ শেষ করে তিনি ফুলতলা ইউনিয়ন হাই স্কুলে ভর্তি হন। আরও পরে ১৯০৭ সালে সেখান থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে ১৯১০ সালে যশোর জেলা স্কুলে ভর্তি হন এবং ম্যাট্রিক পাশ করেন। ম্যাট্রিক পাশের আগেই ১৯০৯ সালে তাঁর স্নেহময় পিতা ইনতিকাল করেন। এজন্য তাঁর শিক্ষাজীবন দারুণ অর্থকষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। পিতৃ বিয়োগের পর তাঁকে বহু কষ্টে তাঁর যাবতীয় খরচ নির্বাহ করতে হত। ১৯১৪ সালে তিনি বি, এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হন। এখানেই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটে। বি, এ ক্লাসের ছাত্র থাকাকালে তিনি 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি যশোর জেলা স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। আরও পরে ১৯২২ সালে কলকাতা ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে এল, টি, ভর্তি হন এবং ১৯২৩ সালে এল, টি পাশ করেন।

www.pathagar.com

ঐ বছরই তিনি বারাসাত গভর্মেন্টি হাই স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যেগাদান করেন। নয় মাস পর তাঁকে মক্তব সাব ইন্সপেক্টর হিসেবে খুলনায় বদলী করা হয়।

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নকে ১৯২৭ সালে খুলনা থেকে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে বদলী করা হয় এবং সেখানে চার বছর চাকরী করার পর ১৯৩০ সালে পুনরায় তাকে বারাকপুর সরকারী হাই স্কুলে বদলী করা হয়। এই স্কুলের সহকারী শিক্ষক হিসেবে ১৯৪৪ সালে তিনি চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

খুলনা শহরে অবস্থানকালে তিনি পুনরায় ১৯৫১ সালে করোনেশন বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের পদে যোগদান করেন এবং কর্মজীবন থেকে দ্বিতীয় বারের মত ১৯৬০ সালে আবার অবসর গ্রহণ করেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায়ই তাঁর মধ্যে সৃজনশীল রচনার প্রেরণা দেখা দেয়। এই সময়ে তিনি 'গো-জাতির প্রতি অত্যাচার' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। পয়গ্রাম কসবা মাইনর স্কুলে অধ্যায়নরত অবস্থায় মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা এক ধর্ম সভায় গেলে সেখানে তিনি দু'টি কবিতা পাঠ করেন। কবিতা দু'টি শুনে মুন্সী মেহেরউল্লা তাঁকে 'শিশু কবি' খেতাবে ভূষিত করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত লেখা 'পেচক পণ্ডিত' নামের একটি কবিতা। কবিতাটি ১৩১৪ সনের ১৫ আশ্বিন 'মোসলেম সুহৃদ' এবং ১৮ আশ্বিন 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় ছাপা হয়।

মাত্র ১৬ বছর বয়সে ১৯০৬ সালে তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত 'কোহিনুর কাব্য'। ফুলতলা (খুলনা) জুনিয়র মাদ্রাসার সেক্রেটারী মৌলভী মোহাম্মদ কাসেমের উপদেশে 'বাংলা মৌলুদ শরীফ' রচনা করতে গিয়ে এই মহাকাব্য রচনা করেন। যদিও 'কোহিনুর কাব্য' গ্রন্থটি তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ তবুও এটি প্রকাশিত হয় পারিজাত, আবেহায়াত ও বাঁশরী নামক তিনটি গ্রন্থ প্রকাশের পর ১৯৯১ সালে। অমিত্রাক্ষরে রচিত এই মহাকাব্যটি মখদুমী লাইব্রেরী, ৫-এ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন মুহাম্মদ মোবারক আলী। এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে।

এই মহাকাব্যে মোট নয়টি সর্গে ২৬৮৯ লাইন রয়েছে। এতে সৃষ্টির আদি হতে হযরত আদম (আঃ)-এর পৃথিবীতে আগমনের ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। বহুল আলোচিত এই মহাকাব্যটি ইসলামী পৌরাণিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে রচিত। এর আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হল এই মহাকাব্যের স্থানে স্থানে আবলীলাক্রমে আরবী, ফারসী ও উর্দু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান-এর মতে,"এই মহাকাব্যের ভাষার বন্ধন কায়কোবাদের মহাকাব্যের তুলনায় দৃঢ়তর। মহাকাব্যটি সুপরিচিত আখ্যানের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে এবং ধর্মানুগত্য অক্ষুণ্ন রেখেও আবেগ ও অনুভূতির চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে পেরেছে।" কিন্তু রচনার ১৩

www.pathagar.com

বছর পর প্রকাশিত হওয়ার কারণে মহাকাব্যটি তেমন আদৃত হয়নি। কারণ ততদিনে মহাকাব্যে বাঙ্গালী পাঠকের আর কোন রুচি ছিল না।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'পারিজাত', এটি ১৯১২ সালে যশোর থেকে মৌলভী আলতাফ হোসেন প্রকাশ করেন। এরপর ১৯১৯ সালে দ্বিতীয়, ১৯২৪ সালে তৃতীয় এবং ১৯৩৩ সালে কাব্যগ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর কবিতাগুলি কবির ছাত্রজীবনে ১৩১২ থেকে মাঘ ১৩১৬ সময়ের মধ্যে লিখিত।

কবি এই কাব্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ৪০টি কবিতার মাধ্যমে আল্লাহর মহিমা কীর্তন করেছেন। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যক্তিত্বকে বিলীন করে দেয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন।

'পারিজাত' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর তৎকালীন সাময়িক পত্রপত্রিকায় ব্যাপক লেখালেখি হয়। 'মোহাম্মাদী' পত্রিকা 'পারিজাত'কে কবিতা কাননের যথার্থ পারিজাত বলে অভিহিত করে। 'মাসিক হাকিম' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়, পারিজাতের লেখায় ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা জ্বলন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। সাথে সাথে লেখার ছটায় ও রচনার পারিপাট্যে পাঠককে গ্রন্থটি দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। এই পত্রিকায় মহাকবি হাফিজ-এর রচনার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ; 'পারিজাত' পড়লে হাফিজ-এর রচনার কথা মনে পড়ে।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'The Bengali' সহ নিম্নে উল্লিখিত পত্রিকাসমূহে এই কাব্যের উচ্চ প্রশংসা করা হয়। সঞ্জীবনী, দৈনিক হাবলুল মতিন, দৈনিক চন্দ্রিকা (২২ আশ্বিন ১৩১৯), প্রভাকর (মহরম ১৩৩১), মোসলেম হিতৈষী (৬ ভাদ্র ১৩২০), সুপ্রভাত (পৌষ ১৩১৯) প্রভৃতি।

অপরদিকে ১৯১৩ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারী তারিখে পারিজাত পাঠ করে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক এ কাব্য গ্রন্থকে String of small poems - - - - - - - - verses are melodious and the rhythm admirable বলে মন্তব্য করেন। আর ১৯১২ সালে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, "গ্রন্থকার কামগান্ধী পার্থিব প্রেমবিলাসিত সাহিত্য ক্ষেত্রে এক দিব্য পবিত্র প্রেমের পারিজাত আনিয়াছেন।"

তাঁর অন্যান্য গ্রন্থাবলী ঃ আবেহায়াত (গযলগ্রন্থ) ১ম প্রকাশ ১৯১৪, ৪র্থ প্রকাশ ১৯৫৩, বাঁশরী (কাব্যগ্রন্থ) ১ম প্রকাশ ১৯১৭, গুলশান (কাব্যগ্রন্থ) ১ম প্রকাশ ১৯২৮, গুলিস্তাঁ (অনুবাদ গ্রন্থ) ১ম প্রকাশ ১৯৩৩, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৪৯, গুলিস্তাঁর গল্প (অনূদিত গল্পগ্রন্থ) ১ম সংস্করণ ১৯২৯, পঞ্চম সংস্করণ ১৯৫৫, চেতনা (প্রবন্ধ সংকলন) ১ম সংস্করণ ১৯১৫, ৩য় সংস্করণ হয়েছিল, সন জানা যায়নি, নিয়ামত

www.pathagar.com

(গল্পগ্রন্থ) ১ম সংস্করণ ১৯১৭, মোল্লাহ্ বাকাউল্লাহ (গল্পগ্রন্থ), ১ম প্রকাশ ১৯৪৭, আলমগীর (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ১ম সংস্করণ ১৯১৯, ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৯৮৮, ভারত সম্রাট বাবর (কিশোর ইতিহাস) ১ম সংস্করণ ১৯১৯, ৩য় সংস্করণ ১৯৩৬, ছেলেদের হযরত মূসা (জীবনী) ১ম সংস্করণ ১৯৩৪, ছোটদের গল্প (গল্প সংকলন) ১ম সংস্করণ ১৯৩৫, পরে এ গ্রন্থটির আরো ৮টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পরীর কাহিনী (কাল্পনিক প্রেম উপখ্যান) ১ম প্রকাশ ১৯১৬, ৫ম সংস্করণ ১৯৪৩, পরীজাদী গুলবাহার (প্রেম উপখ্যান), ১ম প্রকাশ ১৯১৯, জিনপরী (প্রেম উপখ্যান) ১ম প্রকাশ ১৯২৮, হাসির গল্প, ১ম সংস্করণ ১৯১৭, ৯ম সংস্করণ ১৯৪৭, ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ (কিশোর ছড়া কবিতার সংকলন) ১ম প্রকাশ ১৯৪৩, ৩য় সংস্করণ ১৯৫৬, সুন্দর বনের কাহিনী, ১ম প্রকাশ ১৯২৭, ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৯৫৫, কর্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ (জীবনীগ্রন্থ) ১ম প্রকাশ ১৯৩৪, শয়তানের সভা (ব্যঙ্গ রচনা) ১ম প্রকাশ ১৯৪৬, ২য় সংস্করণ ১৯৫৩, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম (প্রবন্ধ গ্রন্থ) ১ম প্রকাশ ১৯৪৯, সংক্ষেপে বিষাদ সিন্ধু, ১ম প্রকাশ ১৯৩৭, বুস্তাঁর (বঙ্গানুবাদ) ৩য় সংস্করণ ১৯৪৯, বুস্তাঁর গল্প এবং ধর্মবিদ্বেষ ও ইসলাম।

এ ছাড়া তাঁর অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলি হল– আজও মনে পড়ে (গল্প গ্রন্থ), জিন্দাপীর আলমগীর (জীবনী গ্রন্থ), মজার গল্প (নৈতিক কথামূলক), গোঁড়ামি ও অন্ধ বিশ্বাস (গদ্য গ্রন্থ), পরলোক প্রসঙ্গে 'মরণের পরে' (২য় খণ্ড), শের সংহার কাব্য (কাব্যগ্রন্থ), সত্যের সন্ধান, ভাবিবার কথা, খোদাপ্রাপ্তির সোজাপথ ও দাদুর দফতর।

তাঁর সময়ের প্রায় সমস্ত জাতীয় পত্রপত্রিকায় তাঁর প্রচুর লেখা প্রকাশিত হয়। নিঃসন্দেহে তিনি পাঠকনন্দিত একজন কবি ও লেখক ছিলেন। যে কারণে তাঁর প্রায় সবগুলি গ্রন্থই ষষ্ঠ সংস্করণ পর্যন্ত তাঁর জীবদ্দশায়ই প্রকাশিত হয়। এমনকি ২/৩টি গ্রন্থের নবম সংস্করণও প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রচুর লেখা পাঠ্যগ্রন্থেরও অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি তাঁর সময়ে ব্যাপকভাবে আলোচিতও হয়েছেন। বিস্ময়কর ব্যাপার হল সম্পূর্ণ প্রতিকুল পরিবেশেও মাত্র চল্লিশ বছর বয়ঃসীমার মধ্যে তাঁর ২৫ খানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

তাঁর উদ্যোগ ১৯১০ সালে 'যশোর-খুলনা সিদ্দিকিয়া সাহিত্য সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই বাঙালী মুসলমানদের প্রথম সাহিত্য সংগঠন। এই সাহিত্য সংগঠনের নিকট থেকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করে পরবর্তীকালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' ১৯১২ সালে সালে ও 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তিনি মোটামুটি ভূমিকা রেখেছেন 'যশোর খুলনা সিদ্দিকিয়া সাহিত্য সমিতি'র যশোর শাখার মুখপত্র মাসিক 'শুকতারা' তাঁর সম্পাদনায় বের

www.pathagar.com

হত। বি, এ, ক্লাশের ছাত্র থাকাকালে ১৯১৪ সালে তিনি 'মাসিক মোহাম্মাদীর' সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৯ সালে তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'মাসিক বঙ্গনূর' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

শেখ হবিবর রহমান ও শ্রী বিশ্বেশ্বর নন্দীর যুগ্ম সম্পাদনায় ১৯৪৯ সালে মাসিক 'ঊষা' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯২৫ সালে তিনি 'নদীয়া সাহিত্য সভা'র পক্ষ থেকে 'সাহিত্যরত্ন' উপাধি লাভ করেন।

১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মিলিটারী কনভয়ের নীচে চাপা পড়ায় তাঁর পা ভেঙ্গে যায়। ১৯৫৭ সালে তিনি বাংলা একাডেমীকে ৩০টি মুদ্রিত ও কয়েকটি অমুদ্রিত গ্রন্থ দান করেন। এ দান ধন্যবাদের সাথে গৃহীত হয় এবং স্বত্বমূল্য বাবদ পাঁচ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়। ১৯৫৯ সালে বাংলা একাডেমী থেকে তিনি এককালীন ১,০০০ টাকার সম্মানী লাভ করেন। ১৯৬০ সালে তিনি বাংলা একাডেমীর ফেলো নির্বাচিত হন। ঐ সনেই তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৬১ সালে ছোট ভাই শেখ ফজলর রহমানের মৃত্যুতে তিনি মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৯৬২ সালের ৭ মে ইন্তেকাল করেন। পরদিন ৮মে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে বাংলা একাডেমীতে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালে শেখ হবিবর রহমান গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড কাব্যগ্রন্থসমূহ) বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়। ◎

www.pathagar.com

গোলাম মোস্তফা ঃ একজন মুসলিম কবির প্রতিকৃতি

১৮৯৭ সালে কবি গোলাম মোস্তফা যশোর জেলার মনোহরপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কাজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মসাল নিয়ে একটু গন্ডগোল আছে। তিনি নিজেই 'আমার জীবন স্মৃতিতে' লিখেছেন—

'আমার জন্মপল্লী হলো ঝিনাইদহ মহকুমার শৈলকুপা থানার অন্তর্গত মনোহরপুর গ্রামে। আমার ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটের বর্ণনানুসারে দেখা যায় ঃ ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে আমার জন্ম। কিন্তু আমার মনে আছে শৈলকুপা হাই স্কুলে ভর্তি হবার সময় আমার আব্বা আমার বয়স প্রায় দুই বছর কমিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই প্রকৃত জন্ম হয়েছিল সম্ভবত ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে। তবে এটা ঠিক যে, যে দিন আমার জন্ম হয় সেদিন বাংলা তারিখ ছিল ৭ই পৌষ, রবিবার।'

সবাই শুনলে তো কবির নিজের জবানীতে তাঁর জন্মের সাল ও তারিখের কথা। তাঁর পিতার নাম কাজী গোলাম রব্বানী। তিনি একজন প্রসিদ্ধ গ্রাম্য কবি ছিলেন। তাঁর দাদা কাজী গোলাম সরওয়ার তো নীল বিদ্রোহের সময় নীলকরদের বিরুদ্ধে জাতীয় উদ্দীপনামূলক কবিতা লিখে ব্যাপক কবি খ্যাতি লাভ করেন।

তোমরা হয়ত শুনে থাকবে বৃটিশ রাজত্বকালে এদেশে মুসলমানদের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। কারণ ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের মধ্যদিয়ে মুসলমানদের সাত'শ বছরের গৌরবময় রাজত্বকালের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ সময়ে সুযোগ বুঝে হিন্দুজনগোষ্ঠী ইংরেজদের সাথে এক হয়ে মুসলমানদের একহাত দেখে নেয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগে। আর শাসক ইংরেজরাতো আছেই। তা'ছাড়া মুসলমানরা ইংরেজদের জানের শত্রু মনে করে তাদের দেয়া কোন সুযোগ গ্রহণ করেনি। ফলে পাশাপাশি বসবাসরত হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা সকল দিক থেকেই এক'শ বছর পিছিয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় কবি গোলাম মোস্তফা চাচ্ছিলেন মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ধারা সৃষ্টি করতে। তিনি নিজেই লিখেছেন- যে যুগে আমার জন্ম সে যুগ বাংলার মুসলমানের অবক্ষয়ের যুগ। সে যুগে আমাদের সাহিত্যের না ছিল কোন স্বাতন্ত্র্য, না ছিলো কোন স্বকীয়তা। প্রত্যেক জাতির মননশক্তি, ঐতিহ্য, ধ্যান–ধারণা ও আশা আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয় তার মাতৃভাষার মধ্যে। সেই হিসেবে বাংলার মুসলমানদের কোন সাহিত্যই তখন রচিত হয়নি। আমি তাই ছোটবেলা থেকেই চেয়েছিলাম মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য রচনা করতে।

আসলে কবি গেলাম মোস্তফা ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুসলমানদের নিকট সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি। অবশ্য এ সময়ে আরো একজন জনপ্রিয় মুসলিম কবি ছিলেন– তিনি হচ্ছেন কবি শাহাদৎ হোসেন।

শিশু গোলাম মোস্তফার লেখাপড়া গ্রাম্য প্রথমিক বিদ্যালয়ে শুরু হয়। এরপর ১৯১৪ সালে শৈলকুপা হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, খুলনার দৌলতপুর কলেজ থেকে ১৯১৬ সালে আই. এ এবং কলকাতা রিপণ কলেজ থেকে ১৯১৮ সালে বি. এ পাস করেন।

চাকরি জীবনের শুরুতেই তিনি সহকারী শিক্ষক হিসেবে ১৯২০ সালে ব্যারাকপুর সরকারী হইস্কুলে যোগদান করেন। এই স্কুলে চাকরিরত অবস্থায় ১৯২২ সালে তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত 'কিশোর' শিরোনামের কবিতাটি। শিক্ষকতাকালে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ থেকে বি টি পাস করেন। ১৯৩৫ সালে সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং ১৯৪৬ সালে প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত হন। ফরিদপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় ১৯৫০ সালে ৩০ বছর শিক্ষকতা করার পর স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।

এই সুদীর্ঘকাল শিক্ষকতার মত মহান পেশার সাথে জড়িত থাকার কারণে এবং শিক্ষা বিজ্ঞানে ডিগ্রিপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে শিশু কিশোরদের মনের খোঁজ তিনি সহজেই পেয়েছিলেন। যাঁর কারণে তোমাদের মত ছোটদের জন্য তিনি অসংখ্য লেখা উপহার দিতে পেরেছেন। তিনি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক পাঠ্য পুস্তকও রচনা করেছেন। যে কারণে অনেকেই ভুল করেন, তাঁর রচিত শিশুপাঠ্য রচনা পাঠ্য পুস্তক সর্বস্ব মনে করে। অবশ্য একথা ঠিক যে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের যাবতীয় বিষয়বস্তুকে নীতি উপদেশ ও ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য করার প্রয়াসী ছিলেন। তবে 'ভাব, বিষয়, ভাষা, ভঙ্গি, ছন্দোগতি, শব্দ লালিত্য, রচনা শৈলী-এ সকল দিকেই তিনি ছিলেন সার্থক শিশু মনোরঞ্জক রচনাকার।'

তিনি তোমাদের জন্য লিখেছেন, আলোক মালা, পথের আলো, আলোক মঞ্জুরী, নূতন আলো, ইসলামী নীতিকথা (১৯৩৫), কাব্য কাহিনী (১৯৩৮), ইতিহাস পরিচয় ও মরু দুলাল (১৯৪৮) -এর মত গ্রন্থ। আলো অভিসারী এ কবি ছোটদেরকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করবার মানসিকতায় তাঁর গ্রন্থের নামকরণও সেইরূপ করেছেন।

কবি গোলাম মোস্তফা খুব ছোটবেলা থেকে লেখালেখি শুরু করেন। 'আমার জীবন স্মৃতি'তে তিনি নিজেই লিখেছেন—

'আমার বেশ মনে পড়ে, আমার কাব্য জীবনের প্রথম উন্মেষ হয় ১৯০৯ খৃস্টাব্দে। আমি তখন শৈলকূপা হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। নীচের ক্লাসে থেকে

www.pathagar.com

ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত আমি শৈলাকুপা হাইস্কুলে পড়েছি। ৫ম শ্রেণীতে উঠবার পরই কেমন যেনো একটা কাব্যিক ভাব আমার মধ্যে এল।'

আমরা দেখতে পাই ১৯১১ সালে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে তাঁর এক বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটি ছড়া। সেটি ছিল-

এস, এস, শ্রীঘ্র এস ওহে ভ্রাতৃধন
শীতল করহ প্রাণ দিয়া দরশন
ছুটিও ফুরাল
স্কুলও খুলিল
তবে আর এত দেরী কিসের কারণ।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'আদ্রিয়ানোপল উদ্ধার'। ১৯১৩ সালে কবিতাটি 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। কবিতাটির বিষয়বস্তু থেকে শুরু করে ভাব, ভাষা, ছন্দ সবই বেশ আকর্ষণীয় হওয়ায় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। কবিতাটি সম্বন্ধে কবি বন্দে আলী মিয়া লিখেছেন—

"সেই সময় ইউরোপ খণ্ডে বলকানে যুদ্ধ চলছিল। তুরস্ক সেনাবাহিনী বুলগেরিয়ানদের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ায় সমগ্র মুসলিম জাহানে একটা বিমর্ষতার ছায়া নেমে এসেছিল। এমন সময় সহসা সংবাদ পাওয়া গেল, কামাল পাশা বুলগেরিয়ানদের নিকট থেকে 'আদ্রিয়ানোপল' পুনরুদ্ধার করেছেন। এই খবরে স্বজাতি-বৎসল কিশোর কবির প্রাণ আনন্দে নেচে উঠলো। তিনি 'আদ্রিয়ানোপল উদ্ধার' নাম দিয়ে এক রাত্রির মধ্যে একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা লিখে ফেললেন। অতঃপর কবিতাটি তিনি 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'তে পাঠিয়ে দিলেন। পরবর্তী সপ্তাহে কবিতাটি মুদ্রিত হলো। কবিতাটির সূচনা ছিলো এইরূপ—

আজিকে প্রভাত কি বারতা নিয়া
ধরায় আসিল নামিয়া।

কবিতায় ছন্দ, ভাব এবং প্রকাশভঙ্গী তখনকার দিনে সবই ছিলো নতুন। এই কবিতায় পাঠক মহলে তাই একটা সাড়া পড়ে গেল। বাংলার মুসলিম সমাজে যে একজন আধুনিক কবির আবির্ভাব হয়েছে এ কথা সহজেই স্বীকৃতি লাভ করলো। গোলাম মোস্তফাও নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হলেন। সেই থেকে তিনি কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখতে শুরু করেলেন।"

মূলতঃ তিনি ছিলেন শিশু কিশোরদের কবি। তাই তো তিনি লিখতে পেরেছেন, 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে'।

www.pathagar.com

তাঁর রচিত শিশুদের মন মাতানো অসংখ্য ছড়া, কবিতা ইত্যাদি রয়েছে। যেমন—

ক. আমরা নতুন, আমরা কুঁড়ি, নিখিল বন-বন্ধনে
ওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা জীবন জাগে স্পন্দনে।

* * *

ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।

(কিশোর)

খ. খুকু মনি জনম নিল যেদিন মোদের ঘরে,
পরীরা সব দেখতে এল কতই খুশী ভরে
আদর করে দুধ খাওয়ালো সোনার পিয়ালাতে,
দোলা দিয়ে ঘুম পাড়ালো জোছ্না মাখা রাতে।
ঘুরে ফিরে নেচে গেয়ে হাত ধরে সব তায়,
কতই খেলা খেলল তারা ফুলের বিছানায়।

(খুকুমনি)

গ. এই করিনু পণ, মোরা এই করিনু পণ-
ফুলের মত গড়ব মোরা মোদের এ জীবন।
হাসব মোরা সহজ সুখে গন্ধ রবে লুকিয়ে বুকে,
মোদের কাছে এলে সবার জুড়িয়ে যাবে মন।

(শিশুর পণ)

ঘ. নুরু, পুশি, আয়েশা, শফী সবাই এসেছে,
আম বাগিচার তলায় যেন তারা হেসেছে।
রাঁধুনীদের শখের রাঁধায় পড়ে গেছে ধুম,
বোশেখ মাসের এই দুপুরে নাইকো কারো ঘুম।

* * *

ধুলোবালির কোর্মা, পোলাও আর সে কাদার পিঠে,
মিছামিছি খেয়ে সবাই বলে- 'বেজায় মিঠে',।
এমন সময় হঠাৎ আমি যেই পড়েছি এসে,
পালিয়ে গেল দুষ্টরা সব খিলখিলিয়ে হেসে।

(বনভোজন)

এ ছড়া কবিতাগুলো চিনতে পারো কি? হ্যাঁ! টিভির জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'নতুন কুঁড়ি'র এ কবির কিশোর কবিতা থেকেই করা হয়েছে। ৭৭

www.pathagar.com

কবি গোলাম মোস্তফা আমাদের সকলের মনমত করে সূরা ফাতিহার ছন্দোবদ্ধ ভাবানুবাদ লিখেছেন,

অনন্ত অসীম
প্রেমময় তুমি বিচার দিনের স্বামী
যত গুণ-গান,
হে চির মহান তোমারি অন্তর্যামী॥

তা'ছাড়া তাঁর লেখা হাম্‌দ, না'ত আমাদের দেশের ছেলে-বুড়ো সবার প্রিয়। এমন কি এগুলো এখনো ঘরে ঘরে মৌলুদ শরীফের সময় পড়া হয়ে থাকে।

যেমন—

ক. 'বাদশাহ তুমি দীন ও দুনিয়ার।'
খ. 'দূর মদীনার স্বপন দেখি বাংলাদেশের কুটির হতে।'
গ. 'হে খোদা দয়াময় রহমানুর রহীম'
ঘ. 'নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি'
ঙ. 'আমার মোহাম্মদ রসূল' ইত্যাদি।

মৌলুদ শরীফে পড়া হয়—

ক. তুমি যে নূরের-ই রবি
নিখেলের ধ্যানের ছবি
তুমি না এলে দুনিয়ায়
আঁধারে ডুবিত সবই।

খ. ইয়া নবী সালাম আলাইকা
ইয়া রসূল সালাম আলাইকা॥
ইয়া হাবীব সালাম আলইকা
সালামো তুল্লাহ্ আলাইকা।

তাঁর এ লেখাগুলো যেভাবে বাঙালী মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সাথে, ইবাদতের সাথে এক করে নিয়েছে অন্য কোন বাঙালী মুসলমান কবির সে সৌভাগ্য হয়নি।

তিনি শিশু কিশোরদের জন্য গদ্যও লিখেছেন। যেমন- 'কী অসীম তোমার করুণা। তুমি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছ এবং অন্যান্য প্রাণী ও পদার্থকে আমাদের অধীন করিয়া দিয়াছ। তোমার চন্দ্র সূর্য প্রতিদিন আমাদিগকে আলো দান করে, তোমার বায়ু আমাদের শরীর জুড়ায়, তোমার নদীর পানি আমাদের তৃষ্ণা মেটায়, এই যে চাঁদের আলো, ফুলের হাসি, পাখির গান, এই যে আসমান, জমিনে এত

www.pathagar.com

শোভা এত রূপ-এ সমস্তই আমাদের সুখ ও আনন্দ দানের জন্য। এই করুণার জন্য আমরা তোমার কাছে চির কৃতজ্ঞ।' (মুনাজাত)

এমনি অসংখ্য লেখা তাঁর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। শিশু উপযোগী এ লেখাগুলো শিশু একাডেমী ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে জরুরীভাবে প্রকাশ হওয়া দরকার।

তাঁর প্রকাশিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলি কি তা জান? সেগুলি হলো–রক্তরাগ (১৯২২), হাস্নাহেনা (১৯২৭), খোশরোজ (১৯২৯), সাহারা (১৯৩৬), কাব্য কাহিনী (১৯৩৮), এবং অনুবাদ গ্রন্থ–মুসাদ্দাসই-হালী (১৯৪১),তারানা-ই-পাকিস্তান (১৯৪৮), বনি আদম (১ম খন্ড, ১৯৫৮), অনুবাদ কাব্য– আল কুরআন (১৯৫৭), কালামে ইকবাল (১৯৫৭) ও শিকওয়াও জবাব-ই শিকওয়া (১৯৬০) এবং কবিতা-সংকলন বুলবুলিস্তান (১৯৪৯)। এ ছাড়া তিনিই লিখেছেন 'বিশ্বনবী'র মত পাঠক নন্দিত বিশালাকার গদ্য গ্রন্থ। তিনি কবি আল্লামা ইকবালের গোঁড়া ভক্ত ছিলেন। কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথেও তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। তিনি নজরুল ইসলামকে নিয়ে এ ছড়াটি লিখেছিলেন।

কাজী নজরুল ইসলাম
বাসায় একদিন গিছলাম
ভায়া গান গায় দিনরাত
সে লাফ দেয় তিন হাত
প্রাণে হর্ষের ঢেউ বয়
ধরার পর তার কেউ নয়।

তিনি বাংলা একাডেমী, টেক্সট বুক বোর্ড, করাচীর বুলবুল একাডেমী, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি (১৯৪৯), পাকিস্তান জাতীয় গ্রন্থাগারের গভর্নিং বডি এবং পাকিস্তান লেখক সংঘের সদস্য ছিলেন।

১৯৫২ সালে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য যশোর সাহিত্য সংঘ তাঁকে 'কাব্য সুধাকর' উপাধি প্রদান করে। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের প্রসিডেন্টের নিকট থেকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পান। ১৯৬০ সালে রাষ্ট্রীয়ভাবে সিতারা-ই-ইমতিয়াজ খেতাব, প্রেসিডেন্ট পদক ও আরো পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পান। ঐ ১৯৬০ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ইন্দো-পাক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে এবং ১৯৬১ সালে কলোম্বতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর অধিবেশনে তিনি পাকিস্তানী লেখকবৃন্দের প্রতিনিধিত্ব করেন।

১৯৬৪ সালের ১৩ অক্টোবর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সেরিব্রাল থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে আমাদের এই প্রাণপ্রিয় মহান কবি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাঁর রূহের মাগফিরাত দান করুন। ◎

www.pathagar.com

বিদ্রোহী শাহজাদা

ছোট্‌টো একটি গ্রাম। তাও আবার আমাদের এই বাংলাদেশে নয়। একেবারে পশ্চিম বংগের বর্ধমান জেলার অজপাড়াগাঁয়ে। চারদিকে ধান কাউনের উম উম গন্ধ। পাখ-পাখালির কিচির মিচির আওয়াজ। সন্ধ্যায় শোনা যায় ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঝাঁঝালো ডাক। কি সুন্দর তাই না ? এই গ্রামের মানুষ আবার 'লেটো' গান ভালবাসতো। একদিন রাতে তারা 'লেটো' গানের আসর বসালো। আশ-পাশের বিশ গ্রামের মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে গান শুনতে!

গান তো নয়, লড়াই। পুরোপুরি দুই দলের লড়াই। তবে কিনা গোলা-বন্দুক দিয়ে নয়, কবিতা দিয়ে। কি মজার কাণ্ড বলোতো। তুমুল লড়াইয়ের পর এক পক্ষ হারে হারে অবস্থা, ঠিক তখনি ঐ দলের এক পুচকে ছেলে লাফ দিয়ে উঠলো। এই ধরো তোমাদের মতই বয়স, কি তারও কম। হাত-পা নাচিয়ে মাথার চুল দুলিয়ে গান শুরু করলো। এক এক করে বিপক্ষ দলের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিল। কি তাজ্জব ব্যাপার। ঐ অতটুকু ছেলে এতকিছু জানে কারোরই যেন বিশ্বাস হয় না। সবারই মনে উঁকি ঝুঁকি মারছে নানা প্রশ্ন। এ শাহজাদা কোত্থেকে এলো? কি তার পরিচয়? শাহজাদাটি কিন্তু বিপক্ষ দলের প্রশ্নের উত্তর দিয়েই ক্ষান্ত হলো না, সে নিজেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বিপক্ষ দলকে ধরাশায়ী করলো, অর্থাৎ হারিয়ে দিল। সমস্ত আসর উল্লাসে ফেটে পড়লো। পুচকে শাহজাদাটি ততক্ষণে মানুষের মাথার ওপর পুতুলের মত নাচছে। দলের সরদার জিতে যাবার আনন্দে বাগ বাগ হয়ে জড়িয়ে ধরলেন শাহজাদাকে। বললেন—

'ওরে আমার বেঙাচি,
বড় হয়ে তুই একদিন সাপ হবি।'

সরদারের কথা কিন্তু ঘটেছিল, সে খুউব বড় কবি হয়েছিল। কি তোমরা পরিচয় জানার জন্য উসখুস করছো তাই না ? অবশ্য করার কথা। তবে এসো তোমাদের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেই– তিনি হচ্ছেন আমাদের সবার পরিচিত এবং প্রিয় কবি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। যিনি আমাদের জাতীয় কবি।

বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ই জৈষ্ঠ পশ্চিম বংগের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর ছোটবেলাকার নাম দুঃখু মিয়া। পর পর ৩/৪টি সন্তান মারা যাবার পর তিনি জন্ম নেন তো, তাই তাঁর আব্বা-মা এই নাম রাখেন। তাঁর আব্বার নাম কাজী ফকির আহমেদ এবং মায়ের নাম জাহেদা বেগম।

www.pathagar.com

তোমরা হয়ত ভাবছো শাহজাদাদের তো হাতী শালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, পাইক, বরকন্দাজ ইত্যাদি কত কিছু থাকে, এ শাহজাদাটিরও নিশ্চয়ই তা আছে। আসলে কিন্তু তোমাদের এই চিন্তা মোটেই ঠিক নয়। এ শাহজাদার ঐ সব কিছুই নেই। বরং বলা যায় সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ একেবারে মিসকিনী হালত। কিন্তু হলে কি হবে? তাঁর মনটাতো আর মিসকিন নয়, একেবারে শাহাজাদার শাহজাদা। ঐ যে, তোমরা শুনেছ না পাতালপুরির সেই ঘুমন্ত শাহজাদার কথা। সেই যে রূপার কাঠি আর জিয়ন কাঠির পরশে রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গালো ? আমাদের আজকের শাহজাদা সেই পাতালপুরিতে যেতে চান কিন্তু ঐ রকম ঘুমাতে না, সব কিছুকে ভেঙে চুরে নিজের হাতের মুঠোয় নেবার জন্য। যেমন তিনি বলেছেন—

পাতল ফুঁড়ে নামবো নীচে
উঠবো আমি আকাশ ফুঁড়ে
বিশ্ব জগত দেখবো আমি
আপন হাতের মুঠেই পুরে।

মাত্র আট বছর বয়সে আব্বা মারা যাওয়ায় সংসারের হাল ধরতে হয় তাঁকে। এ জন্য লেখাপড়ার ইতি টেনে ঐ বয়সেই কখনো মসজিদের ইমামতি, কখনো মক্তবের শিক্ষকতা করে সংসার চালাতে থাকেন। কিন্তু যারা চির বিদ্রোহী তারা চায় স্বাধীন জীবন। আর সে জন্যই তিনি গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন আসানসোল শহরে। এখানে এসে এক রুটির দোকানে মাসে এক টাকা মাইনেই চাকরি নেন। এখানে রাশি রাশি রুটি তৈরি করতে হত তাকে। ঐ সময় তিনি তাঁর কষ্টের কথা ছড়াকারে সুর করে বলতেন—

মাখতে মাখতে গমের আটা
ঘামে ভিজলো আমার গা'টা।

এখান থেকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে দরিরামপুর স্কুলে ভর্তি হন তিনি। তারপর ভর্তি হন রাণীগঞ্জ সিয়ারসোল হাই স্কুলে। যখন তিনি দশম শ্রেণীর ছাত্র ঠিক সেই সময়ে শুরু হয় বিশ্বব্যাপী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। বুঝতেই পারছো বিদ্রোহ যাঁর বুকের ভেতর বাসা বেঁধে আছে, সে কি আর চুপচাপ থাকতে পারে? কখনো নয়। তাইতো দেখা যায় তিনি সেনাবাহিনীতে নাম দেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি হন হাবিলদার। এইখান থেকেই তাঁর কবি প্রতিভার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। এই সময় পত্র-পত্রিকায় বেশ কিছু লেখা ছাপা হয়। ১৯১৯ সনে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শেষ হয়। যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে এসে কিছুদিনের মধ্যেই লেখেন তার বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী'। কি পড়নি—

বল বীর—
বল উন্নত মম শির।

www.pathagar.com

হ্যাঁ এই কবিতায় আমাদের কবি শাহজাদাকে এক রাতের মধ্যেই বিদ্রোহী শাহাজাদাতে রূপান্তরিত করলো। চিনে ফেললো দেশের সব মানুষে। হাস্নাহেনার মত তাঁর গুণের সুবাস ছড়িয়ে পড়লো বাংলার অলিতে-গলিতে। এরপর তিনি দু'হাতে লিখতে শুরু করলেন। অজস্র লেখা। এ লেখাগুলোর প্রায় সব ছিলো অন্যায়, অবিচার আর শোষণের বিরুদ্ধে। সে সময়কার ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধেও তিনি শক্তহাতে কলম ধরেন। তাঁর কলমের ডগা দিয়ে বেরুতে থাকে লকলকে আগুন। তিনি লেখেন—

এদেশ ছাড়বি কিনা বল
নইলে কিলের চোটে হাড় করিব জল।

আরও লেখেন 'ভঙার গান','বিষের বাশী', 'প্রলয় শিখার' মত বিদ্রোহী কাব্য। ইংরেজ সরকার রেগে গেলেন, কবিকে ঢোকালেন জেলে। কিন্তু জেলে ঢোকালে কি হবে? তিনি সেখান থেকেই অন্যান্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে ঘোষণা করলেন—

এই শিকল পরা ছল মোদের
এ শিকল পরা ছল
এই শিকল পরেই শিকল তোদের
করবো রে বিকল।

তিনি আরো বললেন—

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল পূজোর পাষাণ বেদী।
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ!
ধ্বংস-নিশান
উড়ুক প্রাচী'র প্রাচী'র ভেদি'! ইত্যাদি।

গানের ক্ষেত্রে আমাদের বিদ্রোহী শাহজাদা কিন্তু একেবারে সবার ওপরে। **রেকর্ডকৃত গানের সংখ্যা তাঁরই সব থেকে বেশী। বলা যায় গানের মুকুটহীন সম্রাট তিনি।** এই কবি শাহাজাদা তোমাদের মত ছোটদের প্রাণ খুলে ভালবাসতেন।

তিনি ছোটদের মনের কথাটা খুলে বলতে পারতেন। আর কেউ তাঁর মত সুন্দর করে বলতে পারেন নি। তাই তিনি সবার মত ছোটদেরও আত্মার আত্মীয় একান্ত আপন জন। যেমন—

www.pathagar.com

আমি হব সকাল বেলার পাখী
সবার আগে কুসুম বাগে উঠব আমি ডাকি
সূর্য মামা জাগার আগে উঠব আমি জেগে
হয়নি সকাল ঘুমো এখন মা বলবেন রেগে
বলবো আমি আলসে মেয়ে ঘুমিয়ে তুমি থাকো
হয়নি সকাল তাই বলে কি সকাল হবে নাকো
আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে
তোমার ছেলে উঠলে মাগো রাত পোহাবে তবে।

'খুকু ও কাঠ বেড়ালী' ছড়াটি কি তোমাদের মনে পড়ে। হ্যাঁ! কি যেন—

কাঠ বেড়ালী! কাঠ বেড়ালী!
পেয়ারা তুমি খাও
গুড়-মুড়ি খাও ? দুধ-ভাত খাও ?
বাতাবী নেবু? লাউ?
বিড়াল বাচ্চা? কুকুর ছানা?
তাও?
ডাইনি তুমি হোতকা পেটুক!
খাও একা পাও যেথায় যেটুক!
বাতাবী নেবু সকলগুলো
একলা খেলে ডুবিয়ে নুলো!
তবে যে ভারী লেজ উঁচিয়ে
পুটুশ পাটুশ চাও!
ছোঁচা তুমি তোমার সঙ্গে
আড়ি আমার যাও।

'ভোর হলো' কবিতাটি তো তোমাদের সবার-ই একান্ত প্রিয়, কি বলো ? সবার মুখস্ত আছে নিশ্চয়ই—

ভোর হোলো দোর খোলা
খুকুমনি ওঠরে।
ঐ ডাকে জুঁই-শাখে
ফুল-খুকী ছোট রে
খুকুমনি ওঠরে।
রবি মামা দেয় হামা
গায়ে রাঙা জামা ঐ

www.pathagar.com

দারোয়ান গায় গান শোনো ঐ
'রামা হৈ'।
ত্যাজি নীড় করে ভিড়
ওড়ে পাখী আকাশে
এন্তার গান তার
ভাসে ভোর বাতাসে।

আমি আগেই বলেছি তিনি মস্ত কবি ছিলেন। কিন্তু এ্যাত বড় কবি হয়েও তিনি ছিলেন খুব হাসি-খুশী এবং রসিক মানুষ। তিনি হো হো করে হাসতে পারতেন। যাকে বলে অট্টহাসি। ছোটরা যে নানা দাদার সাথে হাসি-তামাসা করে কবি সেটা তার 'খাঁদু দাদু' কবিতায় সুন্দর করে তুলে ধরেছেন।

যেমন—

অমা! তোমার বাবার নাকে
কে মেরেছে ল্যাং?
খ্যাঁদা নাকে নাচছে ন্যাদা-নাক্
ডেঙা ডেং ড্যাং!
ওঁর নাকটাকে কে করল খ্যাঁদা
র‍্যাঁদা বুলিয়ে?
চাম্‌চিকে-ছা ব'সে যেন
ন্যাজুড় ঝুলিয়ে।
বুড়ো গরুর পিঠে যেন শুয়ে
কোলা ব্যাং!
অ মা! আমি হেসে মরি নাক্
ডেঙা ডেং ড্যাং।

এই কবিতার অন্য এক জাগায় বলেছেন—

দাদুর নাকি ছিল না মা অমন বাদুর -নাক্
ঘুম দিলে ঐ চ্যাপ্টা নাকে বাজতো সাতটা শাঁখ।
দিদিমা তাই থাবড়া মেরে
ধ্যাবড়া করেছেন।

বিয়ের মত খোঁশ খবর পেলে ছোটরা যে কি মজা পাই, নিজেরাই বিয়ে করার জন্য বায়না ধরে। 'খোকার খুশী' কবিতায় কবি সুন্দর করে ছোটদের মনের ভাবটা তুলে ধরেছেন—

www.pathagar.com

কি যে ছাই ধানাই পানাই-
সারাদিন বাজছে শানাই'
এদিকে কারুর গা নাই
আজিনা মামার মিয়ে!
বিবাহ্! বাস্, কি মজা!
সারাদিন মণ্ডা গজা
গাপগপ খাওনা সোজা
দেয়ালে ঠেসান্ দিয়ে।।

এই কবিতারই শেষে বলেছেন—

সত্যি, কও না মামা
আমাদের অম্‌নি জামা
অমনি মাথায় ধামা
দেবে না বিয়ে দিয়ে ?
মামীমা আস্‌লে এ ঘর
মোদেরও করবে আদর ?
বাস্ কি মজার খবর।
আমি রোজ কর্‌ব বিয়ে।।

ওদিকে 'খোকার বুদ্ধি' কবিতা পড়লে তো হাসিতে দম আটকে আসতে চাইবে—

সাতটি লাঠিতে ফড়িং মারেন
এমনি পালোয়ান।
দাঁত দিয়ে সে ছিঁড়লে সেদিন
আস্ত আলোয়ান!
ন্যাংটা-পুঁটো দিগম্বরের দলে তিনিই রাজা,
তাঁরে কিনা বোকা বলো ? কি এর উচিত সাজা ?

'খোকার গল্প বলা' কবিতাটি তো আরো মাজার, আরো আনন্দের। বলতে গেলে তোমাদের জন্য এক থালা গরম সন্দেশ।

যেমন—

মা ডেকে কন, "খোকনমনি!
গপ্‌প তুমি জান ?

www.pathagar.com

কও তো দেখি বাপ!"
কাঁথার বাহির হয়ে তখন জোর দিয়ে এক লাফ
বল্‌লে খোকন,"গপ্‌প জানি,
জানি আমি গানও!"
ব'লেই ক্ষুদে' তান্‌সেন সে
তান জুড়ে জোর দিল–
"একদা এক হাঁড়ের গলায় বাঘ ফুটিয়াছিল!"

এই কবিতার অন্যত্র বলেছেন—

এদদিন না রাজা—
ফড়িং শিকার করতে গেলেন খেয়ে পাঁপড় ভাজা!
রাণী গেলেন তুলতে কলমি শাক
বাজিয়ে বগল টাক্ ডুমাডুম টাক্
রাজা শেষে ফিরে এলেন ঘরে—
হাতীর ম-মতন একটা বেড়াল-বাচ্চা শিকার করে'।

'পিলে পট্‌কা' কবিতাটিতেও প্রচুর হাসির খোরাক মেলে–

উট্ মুখো সে সুঁট্‌কো হাশিম
পেট যেন ঠিক ভুঁট্‌কো কাছিম!
চুলগুলো সব বাবুই দড়ি-
ঘুসকো জ্বরের কাবুয় পড়ি।
তিন-কেনা ইয়া মস্ত মাথা,
ফ্যাচকা-চোখে; হস্ত? হাঁ তা
ঠিক গরিলা, লোব্‌নে' ঢ্যাঙা!
নিট পিটে ঠ্যাং সজনে ঠ্যাঙা।

দুনিয়ার সব ছোটরাই কল্পনাপ্রবণ। তারা দুনিয়ার অনেক কিছুকে সহজেই তাদের হাতের মুঠোয় পেতে চাই। কল্পনায় তারা পাড়ি জমায় সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার। নিজেকে অনেক কিছু ভাবে।

যেমন—

থাকবো না কো বদ্ধ ঘরে,
দেখবো এবার জগৎটাকে–
কেমন ক'রে ঘুরছে মানুষ
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে

www.pathagar.com

দেশ হতে দেশ দেশান্তরে
ছুটছে তা'রা কেমন করে,
কিসের নেশায় কেমন ক'রে
মরছে যে বীর লাখে লাখে,
কিসের আশায় করছে তা'রা
বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে ॥

কবির এই সংকল্প কবিতাটি শিশু মনের কি চিরন্তন খোরাক। কবিতাটিতে শিশু মনের নানা কথা বলা হয়েছে, যা শিশুদের জন্য একান্ত আপন। কবিতাটির শেষ দু'লাইন হচ্ছে—

পাতাল ফুঁড়ে নাম্‌ব নীচে,
উঠ্‌ব আমি আকাশ ফুঁড়ে.
বিশ্ব-জগৎ দেখবো আমি
আপন হাতের মুঠোই পুরে'॥

অন্যত্র 'সাত ভাই চম্পা' কবিতায় কবি বলেছেন–

সপ্ত সাগর পাড়ি দেবো আমি সওদাগর
সাত সাগরে ভাসবে আমার সপ্ত-মধুকর।

সব কালের সব ধরনের শিশুদের ফলমূল চুরি করে খাওয়ার মত রোমাঞ্চকর অভ্যেস প্রচলিত আছে। আম, জাম, লিচু এগুলো তাদের কাছে লোভনীয়ও বটে। তবে এ সমস্ত কাজ নির্বিঘ্নে করা সম্ভব হয় না, বিপদ আপদ এসে ঘড়ে চাপে। সে কথাটি কবির 'লিচু চোর' কবিতায় অত্যন্ত নিপূণভাবে ফুটে উঠেছে।

যেমন—

বাবুদের তাল-পুকুরে
হাবুদের ডাল-কুকুরে
সে কি বাস্ করলে তারা,
বলি থাম, একটু দাঁড়া!
পুকুরের ঐ কাছে না
লিচুর এক গাছ আছে না
হোথা না আস্তে গিয়ে
য়্যাববড় কাস্তে নিয়ে
গাছে গ্যে' যেই চড়েছি
ছোট্ট এক ডাল ধরেছি,

www.pathagar.com

ও বাবা, মড়াৎ ক'রে
পড়েছি সড়াৎ জোরে।
পড়বি পড় মালির ঘাড়েই
সে ছিল গাছের আড়েই।
ব্যাটা ভাই বড় নচ্ছার,
ধুমাধুম গোটা দুচ্চার
দিলে খুব কিল ও ঘুষি
একদম জোর্‌সে ঠুসি!

শিশুদের কাছে মা এমন এক ব্যক্তি যা অন্য কোন কিছু দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়। যত আদর সোহাগ, রাগ, অভিমান, বায়না যাই বলি না কেন সব কিছুই মা'য়ের কাছেই তারা করে। মা ছাড়া অন্য কিছুই কল্পনা করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব। যত কষ্ট হোক না কেন মা'য়ের মুখ দেখলেই ভুলে যায়। আর যদি কোলে বসে বুকে মুখ গুঁজে চোখ বুজতে পারে তো কথায় নেই। 'মা' কবিতাতে কবি এ কথা ফুটিয়ে তুলেছেন—

যেখানেতে দেখি যাহা
মা-এর মতন আহা
একটি কথায় এত সুধা মেশা নাই,
মায়ের মতন এত
আদর সোহাগ সে তো
আর কোনখানে পাইবে না ভাই।
হেরিলে ময়ের মুখ
দূরে যায় সব দুখ,
মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরান
মায়ের শীতল কোলে
সকল যাতনা ভোলে
কতনা সোহাগে মাতা বুকটি ভরান।

এমনিভাবে কবি ছোটদের জন্য অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন। কবির দরদী মনের ছোঁয়ায় কবিতাগুলিতে শিশুমনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর ঝিঙে ফুল কবিতা অপূর্ব ছন্দে রচিত। ছোটরা যখন কবিতা পড়ে তখন তারা ছন্দের দোলায় দুলে ওঠে—

www.pathagar.com

ঝিঙে ফুল। ঝিঙে ফুল।
সবুজ পাতার দেশে
ফিরোজিয়া ফিঙে ফুল–
ঝিঙে ফুল---।
গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢল ঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলে দুল
ঝিঙে ফুল।।

মোটকথা কবির ছিল একটা সুন্দর শিশু মন। যে মন দিয়ে তিনি বাংলার প্রতিটি শিশুর মনের কথা বুঝতে পারতেন। আশা করা যায় কবি'র এই সুন্দর সুন্দর লেখাগুলোর জন্য তিনি তোমাদের মাঝে চিরদিন বেঁচে থাকবেন।

শাহ্জাদা তো সব সময় শাহ্জাদা থাকে না। তাদের বয়স বাড়ে, এক সময় বাদশাহ হয় অথবা হয় না। এমনি একদিন বুড়ো হয়। তারপর ইহ্লীলা সাঙ্গ করে। আমাদের বিদ্রোহী শাহজাদাও লেখার কাজ বেশি দিন চালাতে পারেন নি, কাল ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন তিনি। কলম গেল বন্ধ হয়ে, মুখের ভাষাও আর শুনতে পেল না কেউ। চিরদিনের জন্য পঙ্গু হলেন তিনি। এরপরও দীর্ঘ ছত্রিশ বছর বেঁচে থাকার পর আমাদের রাজধানী ঢাকা শহরের পিজি হাসপাতালে ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট তারিখে 'বিদ্রোহী শাহজাদা' সবার সাথে বিদ্রোহ করে সর্বশ্রেষ্ঠ বাদশাহ সবার যিনি সৃষ্টিকর্তা সেই আল্লাহ্‌র দরবারে পাড়ি জমালেন। ইন্নালিল্লাহে---- রাজেউন।

কবির একান্ত ইচ্ছে ছিল মৃত্যুর পর তার কবর মসজিদের পাশে যেন হয়। যেমন—

মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই
যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।

তাঁর শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশেই তাঁকে কবর দেয়া হয়েছে। একবার এসে তোমাদের প্রিয় 'বিদ্রোহী শাহজাদার' কবরটি যিয়ারত করে যেও। কেমন ? ◎

৯১

www.pathagar.com

পল্লীকবি জসীম উদ্দীন

আয় ছেলেরা, আয় মেয়েরা ফুল তুলিতে যাই
ফুলের মালা গলায় দিয়ে মামার বাড়ি যাই।

হ্যাঁ! এ জসীম উদ্দীনের কবিতার লাইন। জসীম উদ্দীনের কবিতার ধরনই আলাদা, স্বাদই আলাদা। তিনি গ্রাম বাংলার সাধারণ বিষয়-আশয়, সাধারণ মানুষের জীবন অত্যন্ত সহজ সরল-ভাষায় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। সত্যিকার অর্থে এমনটি আর কোন কবি-সাহিত্যিক করেন নি। যার কারণে বাংলার মানুষ তাদের এই প্রিয় কবিকে পল্লীকবি বিশেষণে বিশেষিত করেছে।

১৯০৩ সালে ১ জানুয়ারি ফরিদপুর শহর সংলগ্ন তাম্বুলখানা গ্রামে মামার বাড়িতে জসীম উদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাসও ফরিদপুর জেলা শহরের উপকণ্ঠে গোবিন্দপুর গ্রামে। কবির পিতার নাম মৌলবী আনসার উদ্দীন। তিনি অত্যন্ত সুপুরুষ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মানুষ ছিলেন। আনসার উদ্দীন সাহেবের হাত দু'টি ছিল আজানুলম্বিত এবং মুখ ভরা ছিল চাপ দাড়ি। এতে করে কবির পিতাকে অসম্ভব সুপুরুষ ও সুদর্শন মনে হত। তা'ছাড়া সাদা ধুতি পরে, গায়ে পাঞ্জাবী চাপিয়ে যখন মাথায় টুপি দিতেন তখন তাঁকে আরো আকর্ষণীয় চেহারার মানুষ মনে হত। সাদা পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন কবির পিতা গ্রামের এম. ই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।

জসীম উদ্দীনের লেখাপড়ার হাতে খড়ি হয় তাঁর পিতা আনসার উদ্দীনের হাতে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় পার্শ্ববর্তী শোভারামপুরের আম্বিকা পণ্ডিতের পাঠশালায়। এখান থেকে তিনি গ্রামের এম. ই স্কুলে চলে আসেন এবং পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ গ্রহণ করেন। ঐ পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াকালে তাঁকে ফরিদপুর জেলা স্কুলে ভর্তি করা হয়। আজন্ম রসিক জসীম উদ্দীন এ স্কুলে ভর্তি হবার পর স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্ররা তাকে কিভাবে গ্রহণ করেছিল তা তিনি অত্যন্ত রসিয়ে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "সন্ন্যাসীর ভক্ত হইয়া আমি পায়ে জুতা পরিতাম না। পাড়হীন সাদা কাপড় পরিতাম। ক্লাসের ছাত্ররা প্রায় সকলেই শহরবাসী। আমাকে তাহারা গ্রাম্য ভূতের মতোই মনে করিত। আমি কাহারো কাছে যাইয়া বসিলে সে অন্যত্র যাইয়া বসে। আমি শত চেষ্টা করিয়াও কাহারো সাথে ভাব জমাইতে পারি না। আমি সঙ্কোচে পেছনের বেঞ্চে আমার চাচাতো ভাই নেহাজ উদ্দীনের সঙ্গে

www.pathagar.com

জড়সড় হইয়া বসিয়া থাকিতাম। শিক্ষকেরা অন্য ছাত্রদের লইয়া কতো হাসি-তামাসা করিতেন, এটা ওটা প্রশ্ন করিতেন। আমাদিগকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতেন না।'

বুঝতেই পারছো, কবির এ বর্ণনার মধ্যে তার ছোটকালের ব্যথাতুর মনের পরিচয় পাওয়া যায়। শত অবহেলার মধ্য দিয়েও কবি তবুও এ স্কুল থেকেই ১৯২১ সালে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করেন। পরে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে ১৯২৪ সালে আই. এ এবং ১৯২৯ সালে বি. এ পাস করেন। বি.এ পাস করার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৩১ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ পাস করেন।

জসীম উদ্দীনের বাল্যকাল খুবই আর্থিক অনটনের মধ্যে দিয়ে কেটেছে। তিনি নিজেই লিখেছেন, "আমাদের দু'খানা খড়ের ঘর। চারিধারে নলখাগড়ার বেড়া। চাটাইয়ের কেয়ার বা ঝাঁপ বাঁধিয়া ঘরের দরজা আটকানো হয়। সেই ঘরের অর্ধেক খানিতে বাঁশের মাচা। মাচায় ধানের বেড়ি, হাড়ি-পাতিল থরে থরে সাজান। সামনে সুন্দর কারুকার্য খচিত বাঁশের পাতলা বাখারী দিয়া নক্সা করা একখানি ঝাঁপ টাঙান। ....এই ঘরের মেঝেতে সপ বিছাইয়া আমরা শুইয়া থাকিতাম। ......বাজান ঘর-সংসারের কাজ ফেলিয়া স্কুলে যাওয়া-আসা করিতেন বলিয়া আমার দাদা ছমির উদ্দিন মোল্লা বাজানের ওপর বড়ই চটা ছিলেন। বাজান তাঁহার একমাত্র পুত্র। বৃদ্ধ বয়সে তিনি সংসারের সমস্ত কাজ দেখাশুনা করিতে পারিতেন না। কোনো কঠিন কাজ করিতে কষ্টসাধ্য হইলে তিনি বাজানকে খুব গালমন্দ করিতেন।"

যাদের গ্রামীণ জীবন সম্বন্ধে ন্যূনতম ধারণা আছে তারা নিশ্চয় বুঝতে পারছো কবির এ বর্ণিত জীবন এ দেশের নব্বইভাগ লোকের বাস্তব জীবন। অর্থাৎ সত্যি সত্যিই কবি সবদিক দিয়েই এদেশের মানুষের হৃদয়ের অত্যন্ত কাছাকাছির মানুষ ছিলেন।

কবির পিতা আনছার উদ্দীন সাহেব যেমন অত্যন্ত পরিপাটি ও ছিমছাম মানুষ ছিলেন, কবি ঠিক তার উল্টো অর্থাৎ অগোছালো ছিলেন। বাল্যকালে কবি এক সাধুর শিষ্য হয়েছিলেন। সাধুর প্রতি অগাধ বিশ্বাসের কারণে তিনি সাধুর জীবন গ্রহণের মানসে ঐ বাল্যকালেই পায়ে জুতো পরতেন না, গায়ে জামা পরতেন না। শুধুমাত্র পাড়হীন একখন্ড সাদা ধুতির মত কাপড় দিয়েই সব কাজ চালাতেন। কখনো যদি জামা পরেছেন তো সে জামা হতে হতো বোতামহীন। মাথায় চিরুনী পর্যন্ত দিতেন না। মোট কথা দুনিয়ার প্রতি উদাসীন এক 'বালক সাধু' আর কি।

জসীম উদ্দীনের আব্বা আনসার উদ্দীন সাহেব একজন স্বভাব কবি ছিলেন। তিনি কথায় কথায় কবিতা ছড়া বাঁধতে পারতেন বলে জানা যায়। এ প্রসংগে

www.pathagar.com

ইসলামী বিশ্বকোষ লিখেছে, "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ছিল তাঁহার অগাধ অনুরাগ। তাঁহার কবিত্ব শক্তিও ছিল। গাজীপুর উপজিলার কবি গোবিন্দ দাসের ন্যায় তিনি স্বভাব কবি ছিলেন। গায়েন ও কথকদের মত তিনি তাৎক্ষণিকভাবে পদ্য রচনা করিতে পরিতেন। গ্রামের বহুলোক বিবাহাদি উপলক্ষে তাঁহার নিকট হইতে পদ্যে মনোজ্ঞ 'উপহার পত্র' লিখাইয়া নিতেন। জসীম উদ্দীন উত্তরাধিকার সূত্রে সকল পৈত্রিক গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। জসীম উদ্দীনের মাতা ছিলেন সরল-প্রাণ ও স্নেহময়ী পল্লী-রমণী। জসীম উদ্দীনের কবি প্রাণ তাঁহার পিতার স্বভাব-সুলভ চিন্তা-চেতনায় এবং মাতার স্নেহ ধারায় নিষিক্ত হইয়াই সরস হইয়া উঠিয়াছিল।"

দশম শ্রেণীতে পড়াকালে জসীম উদ্দীন রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত 'কবর' কবিতা যা ১৯২৬ সালে 'কল্লোল' পত্রিকায় তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'কবর' কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর রাতারাতিই জসীম উদ্দীনের কবি খ্যাতি বাঙালী পাঠকের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। রবীন্দ্র-নজরুল যুগে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরের এ কবিতা পড়ে ডঃ দীনেস চন্দ্র সেন কবিকে লিখেন, "দুরাগত রাখালের বংশী ধ্বনির মতো তোমার কবিতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছে। তোমার কবিতা পড়ে আমি কেঁদেছি।" শুধু তাই নয় ডঃ সেন তৎকালীন সময়ের নামকরা ইংরেজি পত্রিকা Forward এ জসীম উদ্দীনের ওপর একটি পুরো ইংরেজি প্রবন্ধ লেখেন, যার শিরোনাম ছিল, 'An young mohammadan poet.'

সব থেকে খুশীর খবর হল কবি যখন বি. এ ক্লাসের ছাত্র তখন এই 'কবর' কবিতাটি পুস্তকে সংকলিত হয় এবং ম্যাট্রিক ক্লাসে পাঠ্য হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন বিস্ময়কর ঘটনা আর ঘটেনি।

ছাত্রাবস্থায়ই কবি কর্মজীবনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২৪ সালে তিনি ৭০ টাকা আর্থিক মাসোহারার বিনিময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পল্লী সাহিত্য সংগ্রাহক নিযুক্ত হন। এম. এ পাস করার পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এরপর তিনি ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের অধীনে ঐ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ এ্যাসিস্ট্যান্ট নিযুক্ত হন। তিনি এ পদে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।

১৯৩৭ সালে কবি বিবাহ করেন। পর বছর ১৯৩৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি ও বাংলা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত কৃতিত্বের সাথে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক সরকারের প্রচার বিভাগের পাবলিসিটি অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হবার পর তিনি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনে উক্ত পদে বহাল থাকেন এবং ১৯৬১ সালে ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। এ সময়ে কণ্ঠ শিল্পী আব্বাস উদ্দীন তাঁর সহকর্মী ছিলেন।

www.pathagar.com

এতক্ষণের আলোচনায় নিশ্চয় বুঝা গেল গায়ের সেই অগোছালো ছেলেটি সব দিক দিয়েই বড় মাপের লোক ছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি তিনি তোমাদের জন্যও বড় মাপের অনেক লেখা উপহার দিয়েছেন। এমনিতেই তাঁর মনটা ছিল মানুষের জন্য আকাশের মত উদার। আর সে মানুষ যদি হয় গায়ের লোক, বা তোমাদর মত শিশু-কিশোর তা'হলে তো কথাই নেই। যেমন তিনি বলেন,

"তাই তাহারে আদর করে
সব শিশুরে আদর করি,
শুনিয়ে তারে রূপকথা যে
সকল শিশুর পরাণ ভরি।"

ছোট সুন্দর ফুটফুটে খুকী দেখলে কবি অমনি খলবলিয়ে উঠেন—

"এই খুকীটি আমায় যদি একটু আদর করে
একটি ছোট কথা শোনায় ভালবাসার ভরে;
তবে আমি বেগুন গাছে টুনটুনীদের ঘরে,
যত নাচন ছড়িয়ে আছে আনব হরণ করে;
তবে আমি রূপকথারি রূপের নদী দিয়ে,
চলে যাব সাত সাগরে রতন মানিক নিয়ে;
তবে আমি আদর হয়ে জড়াব তার গায়,
নূপুর হ'য়ে ঝুমুর ঝুমুর বাজত দু'টি পায়।"

আবার যে সমস্ত শিশু-কিশোর অভাব-অনটনের মধ্যে জীবনপাত করে তাদের নিয়েও তিনি লিখেছেন। যেমন—

"পেটটি ভরে পায় না খেতে, বুকের ক'খান হাড়,
সাক্ষী দিছে অনাহারে ক'দিন গেছে তার।
মিষ্টি তাহার মুখটি হ'তে হাসির প্রদীপ রাশি,
তারপরেতে নিবিয়ে গেছে দারুণ অভাব আসি।"

এমনি দরদ দিয়ে লিখতে পারা সত্যিই সবার পক্ষে সম্ভব নয়।

ছোটদেরকে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে লিখেছেন—

"আমার বড়ি যাইও পথিক
বসতে দেবো পিঁড়ে
জলপান যে করতে দেবো
শালি ধানের চিড়ে।

www.pathagar.com

উড়কি ধানের মুড়কি দেবো
বিন্নি ধানের খই
ঘরে আছে ফুল বাতাসা
চিনি পাতা দই।"

কি জিহ্বায় পানি এসে যাচ্ছে তাই না ? আবার শহরে বন্ধুকে তিনি কিভাবে দাওয়াত করছেন—

"তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে
আমাদের ছোট গায়
গাছের ছায়ায় লতায় পাতায়
উদাসী বনের বায়।"

ইত্যাদি হাজারো উদ্ধৃতি দেয়া যাবে তার লেখা থেকে।

তাঁর শিশুতোষ লেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বইগুলো হচ্ছে-হাসু, একপয়সার বাঁশি, ডালিম কুমার এবং বাংগালীর হাসির গল্প ১ম ও ২য় খণ্ড।

হাসু গ্রন্থটি একটি ছড়ার বই। এতে একটি ছড়ার গল্পসহ ২৬টি পদ্য আছে। 'এক পয়সার বাঁশি'-তে ১৭টি কবিতা। তা হল-এক পয়সার বাঁশি, গল্প বুড়ো, মা ও খোকা, খোসমানী, আসমানী, খোকাপাখী, হাসুমিয়ার পাখিস্থান, হাসুমিয়ার চিঠি, দুষ্ট মেয়ে, বাঁশুমনির জন্মদিন, আবল তাবল, কবি ও চাষার মেয়ে, ছেলের মেয়ে, খোকনের জন্মদিনে, পূর্ণিমা, গানটি রচি কার তরে ও দুষ্টু।

কবিতাগুলোর শিরো নাম দেখেই আঁচ করা যায় কবি কি লিখেছেন, আর কাদের জন্য লিখেছেন।

'ডালিম কুমার' তো তোমাদের জন্য এক চমকপ্রদ গল্প কাহিনী। রংপুর অঞ্চলের গাজীর গানের অনুরূপ লেখা একটা রূপকথার বই এটি।

'বাংগালীর হাসির গল্প' দু'খণ্ডে আছে ৫৩টি মজার মজার গল্প যা পড়লে হাসির দম্‌কে পেট ফুলে উঠে, দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

জসীম উদ্দীন কিন্তু শুধু ছোটদের নিয়েই লেখেন নি। তিনি বড়দের নিয়েও প্রচুর লিখেছেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা কাব্য ২০ খানা, নাটক ১৩ খানা, জারী ও মুর্শিদী গানের সম্পাদনা করেছেন দু'খানা বই।

কবির বহুল পাঠ্য কাব্য গ্রন্থ হচ্ছে, নকশী কাথাঁর মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট ও রাখালী। যা দেশে-বিদেশে কবিকে বহুল পরিচিতি ও খ্যাতির আসনে সমাসীন করেছে।

www.pathagar.com

নকসী কাঁথার মাঠ, বেদের মেয়ে, বাংলাদেশের হাসির গল্প ও জসীম উদ্দীনের নির্বাচিত কবিতা ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কবি বিশ্বের বহু দেশ ভ্রমণ করারও সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি 'হলদে পরীর দেশ' নামক গ্রন্থের জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে বাঙালীর এই প্রিয় কবি, পল্লী কবিকে বাংলা একাডেমী কোন সম্মানে ভূষিত করেনি। এটা বাংলা একাডেমী ও বাংগালী জাতির জন্য সত্যিই লজ্জাকর। অবশ্য তাঁর বাসস্থান 'পলাশ বাড়ি' যে রোডে অবস্থিত তার নাম 'কবি জসীম উদ্দীন স্মরণী' এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আবাসিক হলের নাম 'কবি জসীম উদ্দীন হল' রাখা হয়েছে।

কবি জসীম উদ্দীন তাঁর নিজ বাসভবন 'পলাশ বাড়ি'তে ১৯৫৩ সাল থেকে একটি সাহিত্য সভা করে আসছিলেন, যা আমৃত্যু জারি রেখেছিলেন। ১৯৭৬ সালের ১৪ মার্চ তারিখে সাহিত্য সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সাহিত্যিক সাংবাদিক মোদাব্বের ও কবি আজিজুর রহমান উপস্থিত হয়ে সাহিত্য সভার বদলে কবির জানাযা পড়েছিলেন। অর্থাৎ ১৯৭৬ সালের ১৪ মার্চ তারিখে বাংলার আপামর জনসাধাণের নয়নের মণি পল্লীকবি জসীম উদ্দীন ইন্তেকাল করেন। এ সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। ◎

www.pathagar.com

বন্দে আলী মিয়া

তোমাদেরকে এখন এমন এক ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে বলব যিনি তাঁর জীবনের সিংহভাগ সময় এবং শ্রম তোমাদের জন্যই ব্যয় করেছেন। তিনি হলেন কবি বন্দে আলী মিয়া। জানি এ নামটি তোমাদের পরিচিত ও প্রিয়। বন্দে আলী মিয়া ১৯০৬ সালের ১৭ জানুয়ারি পাবনা শহরের শহরতলীর রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম মুন্সী উমেদ আলী মিয়া এবং মাতার নাম নেকজান নেছা। সাহিত্যের প্রায় সকল বিষয়ে- ছড়া, কবিতা, গল্প , উপন্যাস, নাটক, জীবনী, রহস্য- রোমান্স, রূপকথা, উপকথা ইত্যাদি নিয়ে তিনি লিখেছেন। এসব বিষয়ে তিনি বড়দের জন্য যেমন লিখেছেন, ছোটদের জন্য লিখেছেন তার চেয়ে ঢের বেশি। সত্যি কথা হল তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষেই মনে-প্রাণে একজন শিশু-সাহিত্যিক এবং স্বার্থক শিশু-সাহিত্যিক।

কবি বন্দে আলী মিয়ার শিক্ষা জীবন শুরু হওয়ার পূর্বেই তাঁর স্নেহময় পিতা উমেদ আলী মিয়া ইন্তেকাল করেন। মা নেকজান নেছা ইয়াতীম শিশুপুত্রকে গ্রামের মজুমদার একাডেমীতে ভর্তি করে দেন এবং এখান থেকেই ১৯২৩ সালে তিনি প্রবেশিক্ষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কবি বন্দে আলী মিয়া ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকতে ভালবাসতেন। এজন্য আত্মীয়-স্বজনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাসের পর নিজে কলকাতা গিয়ে বৌ বাজারে অবস্থিত ইন্ডিয়ান আর্ট একাডেমীতে ভর্তি হন। ১৯২৭ সালে আর্ট একাডেমীর শেষ পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এরপর বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খাঁর উৎসাহে তিনি টাঙ্গাইলের করটিয়া সাদাত আলী কলেজে আই. এ ভর্তি হন। কিন্তু কলকাতা ছেড়ে মফস্বলের কলেজে ভাল না লাগায় তিনি ১৯২৯ সালে কলেজ ত্যাগ করেন। তাঁর লেখাপড়া আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। এরপরই বন্দে আলী মিয়া মায়ের একান্ত আগ্রহে বগুড়া শহরের বৃন্দাবন পাড়া নিবাসী রাবেয়া নামের এক সুন্দরী রমণীকে বিয়ে করে সংসারী হন।

কবি বন্দে আলী মিয়া ১৯৩০ সালে কলকাতা কর্পোরেশন পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে চাকরি গ্রহণ করেন এবং ১৯৫০ সাল পর্যন্ত একটানা কুড়ি বছর তিনি এ চাকরিতে বহাল ছিলেন। এই শিক্ষকতার জীবনেই তিনি শিশুদের প্রতি আকৃষ্ট হন, ভালভাবে শিশুমনকে জানার সুযোগ পান। তিনি নিজেও ব্যক্তিগত জীবনে শিশুদের মতোই সহজ-সরল ছিলেন। তাঁর মুখে সব সময় হাসির

www.pathagar.com

একটা মিষ্টি ঝিলিক ছড়িয়ে থাকতো। দেখা মাত্রই ছোটদেরকে কাছে টানার তাঁর চমৎকার সম্মোহনী ক্ষমতা ছিল। তিনি তাই পরিচিত ছোটদের কাছে কবি দাদু হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৬৪ সালে তিনি রাজশাহী বেতারের স্ক্রিপ্ট রচয়িতা হিসেবে যোগ দেন। তিনি ঐ সময়ে 'ছেলে ঘুমানো' নামক শিশু অনুষ্ঠানের জন্য প্রতিদিন শিশু উপযোগী গল্প গান ইত্যাদি লিখে দিতেন।

কবি যখন ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র তখন তাঁর মেজ মামা তাঁকে কয়েকটি বই উপহার দেয়। এগুলো পড়তে গিয়ে শিশু কবির মনে সাহিত্য অনুরাগ অংকুরিত হয়। পরে সপ্তম শ্রেণীতে থাকাকালে গোপনে তাঁর খাতায় ছড়া, কবিতা ও ছবি আঁকতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় যখন, তখন তিনি নবম শ্রেণীর ছাত্র। সাপ্তাহিক 'বেঙ্গল গেজেট' নামক পত্রিকায় 'ছিন্নপত্র' শিরোনামের কবিতা তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা। তার লেখা সম্বন্ধে কবি লিখেছেন, 'বাংলা ১৩২৮ সালের কথা। আমি সে সময়ে বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র। মাঝে মাঝে লুকিয়ে কবিতা লিখবার চেষ্টা করি।...... অতিশয় সঙ্কোচ আর লজ্জা। সাহপাঠী বন্ধুদের দেখালে তারা মনে করবে হয়তো কোনো বই থেকে কারো লেখা নকল করে বাহবা নেবার জন্যে তাদের কাছে আমার নিজের বলে বলছি। তবুও লিখি এবং খাতাটা সযত্নে লুকিয়ে রাখি।'

'ছিন্নপত্র' কবিতাটি ছাপা হওয়ার পর কবির সে সময়কার অনুভূতি সম্বন্ধে লিখেছেন, '.... লেখাটি ছাপা হয়ে যেদিন পত্রিকাটি আমার হতে এসে পৌঁছুলো সেদিনটি আমার জীবনে পরম আনন্দের–পরম বিস্ময়ের। প্যাকেট খুলে পাতা উল্টিয়ে দেখতে পেলাম বড়ো বড়ো অক্ষরে কবিতাটির শিরোনাম ছাপা-তার নীচে কবিতাটি। নিজের লেখা প্রথম ছাপা হলে কি যে আনন্দ হয় তা এই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করলাম। একান্ত আগ্রহে লেখাটির দিকে চেয়ে রইলাম। বারম্বার মনে হতে লাগলো, আজ আমার কি শুভ দিন। আমার নাম খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে এবং আমার লেখা কবিতাটিও। পথের কাঙাল যেন লটারির টিকেটে সহসা আজ লক্ষপতি হয়েছে।'

বন্দে আলী মিয়ার প্রথম প্রকাশিত বই 'চোর জামাই' ছিল শিশু-কিশোরদের উপযোগী। যা ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়। তোমরা শুনলে খুশি হবে যে, এ বইয়ের ছবিগুলো ছিল কবির নিজের হাতে আঁকা। 'চোর জামাই' প্রকাশিত হওয়ার পরপরই কবি পাঠকের কাছে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করলেন। তিনি ছবি এঁকেও প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর আঁকা মোনজাতের ছবিটি ব্যাপক প্রচার ও প্রশংসা লাভ করে।

কবি বন্দে আলী মিয়ার তোমাদের জন্য লেখা অনেক মনকাড়া কবিতা রয়েছে, যেমন—

www.pathagar.com

আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর
থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর।
পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই
এক সাথে খেলি আর পাঠশালে যাই।
আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান,
আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে, বাঁচাইছে প্রাণ।
মাঠ ভার ধান তার জল ভরা দীঘি,
চাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকি মিকি।
আম গাছ, জাম গাছ, বাঁশ ঝাড় যেন,
মিলে মিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন।
সকালে সোনার রবি পূর্ব দিকে ওঠে,
পাখি ডাকে বায়ু বায় নানা ফুল ফোটে।

(আমাদের গ্রাম)

চমৎকার কবিতা তাই না? খেয়াল করে দেখো পুরো কবিতাটির ভেতর কোন যুক্ত অক্ষর নেই। কারণ কবি শিশু মন বুঝতেন, তাদের কষ্টের কথা বুঝতেন। তাই তিনি যতদূর সম্ভব সহজ-সরল অথচ সুন্দর ভাষায় লিখেছেন।

তিনি লিখেছেন—

আয় আয় পিস পিস,
দেখ ভাই ময়না,
চুপ চুপ, গোলমাল
কথা আর কয় না।

(আফরোজার পুষি)

ব্যাঙের বিয়ে ছড়াতে লিখছেন—

ছোট কোলা ব্যাং
ডাকে গ্যাং গ্যাং।
তার নাকি বিয়ে
টুপি মাথায় দিয়ে।

কবি বন্দে আলী মিয়ার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় পৌনে দুইশত। এর মধ্যে ১২৫ খানা বই-ই ছোটদের উপযোগী। এর মধ্যে ইতিহাস আশ্রয়ী বই, যেমন-ছোটদের বিষাদ সিন্ধু, তাজমহল, কোহিনুর, কারবালার কাহিনী ইত্যাদি। তিনি কোরআন ও হাদীসের কাহিনী নিয়েও গল্প লিখেছেন, আবার গুলিস্তাঁর গল্প,

www.pathagar.com

ঈশপের গল্প, দেশ-বিদেশের গল্প, শাহানামার গল্প লিখেছেন। তিনি অনেকগুলি জীবনী লিখেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- আমাদের নবী, হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর ফারুক, হযরত খাদিজা, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা, হযরত ফাতেমা হযরত মূসা, তাপসী রাবেয়া, সিরাজউদৌলা, হাজী মহসীন, ছোটদের নজরুল ইত্যাদি।

এসব লেখার মধ্যে দিয়ে তিনি আগামী দিনের নাগরিক শিশু-কিশোরদের চরিত্র গড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি ভাল করেই জানতেন—

'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা
সব শিশুরই অন্তরে।'

তাই তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত শ্রম এবং চেষ্টা আগামী দিনের ভবিষ্যত শিশুদের গড়ার মানসে শিশু সাহিত্য রচনার চেষ্টা করেছিলেন। আমরা বলব তিনি সফলও হয়েছেন। তিনি ইসলামের সুমহান আদর্শ শিশুদের কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরার জন্য পবিত্র কোরআনের ১৫টি কাহিনী নিয়ে ১৫টি গল্প লিখেছেন। হৃদয়-গ্রাহী ভাষায় লেখা এ গল্পগুলি হল–আদি মানব ও আজাযিল, স্বর্গচ্যুতি, হাবিল ও কাবিল, মহাপ্লাবন, আদ জাতির ধ্বংস, ছামুদ জাতির ধ্বংস, বলদর্পী নমরুদ, হাজেরার নির্বাসন, কোরবানী, কাবা গৃহের প্রতিষ্ঠা, ইউসুফ ও জুলেখা, সাদ্দাদের বেহেশত, পাপাচারী জম্ জম্, কৃপণ কারুন, ফেরাউন ও মূসা ইত্যাদি।

পবিত্র হাদীস থেকে ১৪টি কাহিনী নিয়ে তিনি ১৪টি গল্প লিখেছেন, বইয়ের নাম দিয়েছেন 'হাদীসের গল্প।' এ বইয়ের গল্পগুলি এ রকম-দীন জনে দয়া করো, সত্য নিষ্ঠার পুরস্কার, ক্ষুধাতুরে খাদ্য দাও, স্বল্প কথা, খোড়া শয়তানের বাহদূরী ইত্যাদি।

তাঁর গল্প লেখার নমুনা এ রকম- 'এক দেশের এক রাজা। রাজার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, রাজকোষে হীরামানিক, তবু রাজার মনে সুখ নাই। রাজার কোন ছেলে-পুলে নাই। একটি মেয়েও যদি হ'তো তবু রাজ-রাণীর সুখ থাকতো।' ['পরীরাণী'-বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা)

অন্যত্র লিখছেন—

বাঘ। হালুম-খক্ খক্ খেঁকশেয়াল সাহেব। আদাব!

খেঁকশেয়াল। মাননীয় বাঘ বাহাদুর যে, আসুন, আসুন, আদাব। আপনি বনের বাদশা, শত কাজ ফেলে সময় ক'রে যে আমার পুত্রের বিবাহে আসতে পেরেছেন- আমার নসিব। আপনার পলাশ ডাংগায় সবাইকে তো দাওয়াত করেছিলুম, তারা এখনো এসে পৌছুলেন না।।

www.pathagar.com

বাঘ। আমি না এলেতো কেউ আগে আসতে পারে না, ঐ যে সবাই আসছেন। কি হে পণ্ডিত এত দেরী যে?

শৃগাল। ক্যাহুয়া- ক্যাহুয়া- একটু দেরী হুয়া। আসবার পথে একটা রাম ছাগলের বাচ্চা পেলুম, নাশতাটা না সেরে আসি কি করে? জানি তো বিয়ে বাড়ি কখন বরাতে জুটবে বলা যায় না। (বিড়ালের প্রবেশ)।

বাঘ। পণ্ডিত রসিক লোক, নাশতা হয়েছে ভালোই হয়েছে। এই যে সরকার সাহেব, আদাব।

বিড়াল। আদাব, খেঁকশিয়াল সাহেব, আপনার পুত্রকে এই ইদুরের মুক্তা মালা ছড়া আমার আশীর্বাদ দেবেন।

খেঁকশিয়াল। এসব আবার কেন? নিমন্ত্রণ পত্রে তো উল্লেখ ছিল, 'লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়।' তা মালাছড়া যখন এনেছেন– (কুমীরের প্রবেশ)

'খেঁক শেয়ালের দাওয়াত'-(টোটো কোম্পানির ম্যানেজার)

কার না ভাল লাগে পশুদের এমন চমৎকার সংলাপ ? কবি বন্দে আলী মিয়া শিশু-কিশোর উপযোগী জীবনী গ্রন্থগুলো রচনা করেছেন অসম্ভব হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় করে। যাতে এ লেখাগুলো পড়ে ছোটরা পুরোপুরি আনন্দ উপভোগ করতে পারে এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদেরকে আগামী দিনের যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। যেমন তিনি 'আমাদের নবী' গ্রন্থে মহানবী (সা) সম্বন্ধে লিখেছেন, 'আকাশে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ। সেই চাঁদের আলোতে চারিদিক পুলকিত। বিবি আমিনা এক ঘরে ছট্ফট্ করছেন। প্রহরের পর প্রহর কাটতে থাকে। নিখিল বিশ্ব স্তব্ধ নীরব। রাতের শেষ প্রহর, চাঁদ আকাশের গায়ে হেলে পড়েছে। বিবি আমিনার আঁধার ঘর আলোকিত করে একটি ফুটফুটে সুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হলেন।

.... বাতাস ছুটে এসে খর্জুর বীথি আর আঙ্গুর গুচ্ছকে খোশ আমদেদ জানিয়ে গেল। জাফরানের খুশবু এই খবর নিয়ে ছুটলো মরু আরবের দিগ-দিগন্তে।

এসেছে দীনের নবী
 মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লে আলা
তাঁহারি রওশানিতে
 জাহান হলো উজ্জ্বালা।

www.pathagar.com

এ প্রাণস্পর্শী বর্ণনা নিঃসন্দেহে বড়দেরও হৃদয় না কেড়ে পারে না।

শিশু সাহিত্য রচনার ব্যাপারে তিনি ছিলেন পুরোমাত্রায় সচেতন। তিনি এ ব্যাপারে লিখেছেন, 'শিশুদের ব্যাপারে ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে আমি সব সময়েই পাঁচ থেকে আট বৎসরের শিশু, আট থেকে বারো বৎসরের বালক এবং বারো থেকে ষোল বৎসরের কিশোরদের বিষয় মনে রেখেই কাজ করে থাকি। ভাষার মাধ্যমেই আমরা সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে উত্তীর্ণ হই। শিশুদের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম। এ ব্যাপারেও আমি অত্যন্ত সজাগ। আমি ওদের সবার জন্যই লিখে চলেছি।'

কবি বন্দে আলী মিয়ার লেখার প্রশংসা করেছেন বাংলা সাহিত্যের বড় বড় দিকপালেরা। এর মধ্যে রয়েছেন, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাকবি কায়কোবাদ, কাজী নজরুল ইসলাম, কবি গোলাম মোস্তফা, কবি জসীম উদ্দীন, কবি-সমালোচক আবদুল কাদির প্রমুখ। আর ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছেন তার ওপর জ্ঞানগর্ভ একটা পুরো প্রবন্ধ। যা তৎকালীন সময়ে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। কবির কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬২ সালের বাংলা একাডেমী তাঁকে শিশু সাহিত্যে পুরস্কার প্রদান করে। আর ১৯৬৫ সালে তাঁকে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ আবদান রাখার জন্য দেয়া হয় প্রেসিডেন্ট পুরস্কার। রাজশাহীর জনগণ ১৯৭৫ সালের ১২ জানুয়ারি তাঁকে আন্তরিক সংবর্ধনা প্রদান করে। রাজশাহীর উত্তরা সাহিত্য মজলিশ ১৯৭৮ সালে কবিকে সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করে এবং উপলক্ষে তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করা হয়।

এই নিরলস সাহিত্য সেবী, কবি শিশু-সাহিত্যিক কবি বন্দে আলী মিয়া ২৮ জুন ১৯৭৯ সালে সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। আমাদের জানামতে তাঁর ২৫টা অপ্রকাশিত গ্রন্থ রয়েছে যা বাংলা একাডেমী ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা উচিৎ বলে মনে করি। তাঁর রাচনাবলীও প্রকাশ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ◉

www.pathagar.com

রাজপুত্তুর কবি

এই হিং নেবে হিং, কিসমিস, খুবানি, আঙুর, পেস্তা, বাদাম, আখরোটঃ নে-বে। লম্বা পিরহানের জেবে কলসী ভাঙা চাড়া, কড়ি এসব ভরে ঝুমুর ঝুমুর শব্দ তুলে দরাজ গলায় হেঁকে চলেছে এক কিশোর। বড় বড় উজ্জ্বল দু'টি চোখ। যেন সে দু'টো চোখ দিয়ে ঠিকরে পড়ছে সত্যের দ্যুতি। লম্বা বাঁকানো বাঁশীর মত নাক, প্রশস্ত কপাল, ঘাড় অবধি নেমে যাওয়া ঝাঁকড়া চুল–সব মিলিয়ে এক অপরূপ রাজপুত্তুর। কাবুলিওয়ালা সাজার ইচ্ছায় যে রাজপুত্তুর বেশ হাঁক-ডাক করতো।

রাজপুত্তুরটির যেমন ছিল দরাজ গলা, আগুনঝরা চোখ, বাবরী দোলানো চুল, তেমনি ছিল দুরন্ত সাহস। ভয় কখনো তার দিলে বাসা বাঁধেনি। যা সত্য, যা সুন্দর তা সে আজীবনই মেনে চলেছে, সমাজেও প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে।

তোমরা হয়ত ভাবছো, সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারের কোন কথা বলছি। আসলে তা নয়। এ রাজপুত্তুরটির রাজমহল আমাদের দেশের এক গণ্ডগ্রামে। অতীতকালে তাঁর এলাকাটা শাসন করেছে রাজা প্রতাপাতিদ্য, রাজা বিক্রমাদিত্য, খান জাহান আলীর মত রাজা-বাদশারা। হ্যাঁ! দেশটির নাম যশোরাদ্য দেশ। পরে এটা যশোর জেলা নামে পরিচিত হয়। এ জেলারই মাগুরা মহাকুমার আওতাধীন মাঝাইল গ্রামে সে রাজমহল। রাজপুত্তুরটির নাম ফররুখ। পুরো নাম সৈয়দ ফররুখ আহমদ।

১৯১৮ সালের ১০ই জুন ফররুখ আহমদ এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আব্বা খান সাহেব সৈয়দ হাতেম আলী একজন জাদরেল পুলিশ অফিসার ছিলেন। মায়ের নাম বেগম রওশন আখতার। মা-বাবার দ্বিতীয় সন্তান তিনি।

গ্রামের স্কুলেই তার লেখাপড়ার হাতে খড়ি। এরপর কলকাতার তালতলা মডেল স্কুলে, বালিগঞ্জ হাই স্কুলে, খুলনা জেলা স্কুলে লেখাপড়া করেন। খুলনা জেলা স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। বালিগঞ্জ হাই স্কুলে পড়াকালে কবি গোলাম মোস্তফাকে শিক্ষক হিসেবে পান। আর খুলনা জেলা স্কুলে পান কবি আবুল হাশিম ও অধ্যাপক আবুল ফজলকে শিক্ষক হিসেবে। কলকাতার রিপন কলেজ থেকে ১৯৩৯ সালে আই, এ পাস করেন। পরে দর্শনে অনার্স নিয়ে বি, এ ভর্তি হন। আরো পরে ইংরেজিতে অনার্স নেন। কিন্তু ঐ পর্যন্ত যে কোন কারণেই হোক তাঁর আর অনার্স পরীক্ষা দেওয়া হয়নি।

www.pathagar.com

হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম, এই রাজপুত্তুরটি কিন্তু সত্যি সত্যিই রাজপুত্তুরের মতোই ছিলেন। তিনি যখন হাঁটতেন মনে হত কেশর দুলিয়ে সিংহের বাচ্চা হেঁটে যাচ্ছে। তাঁদের বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেছে মধুমতি নদী। এই খরস্রোতা মধুমতি নদীতে তিনি নিত্য দিন ঝাঁপিয়ে পড়তেন তাঁর দলবল নিয়ে। পূর্বেই বলেছি ভয় তাকে কখনো স্পর্শ পর্যন্ত করতো না। ফলে হাঙর কুমীরকে তিনি থোড়াই কেয়ার করতেন। বরং তিনি বলতেন, হাঙর-কুমীর যদি থাকে, তবে আমার ভয়েই তারা পালিয়ে যাবে। তিনি সারা জীবন এমনি সাহসেরই পরিচয় দিয়ে গেছেন। কারো কাছে কোন দিন কোন কারণে মাথা নত করেন নি।

রাজপুত্তুরটি কিন্তু খুব ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। সাত সকালে মাঠের দিকে বেরিয়ে পড়তেন। তন্ময় হয়ে ধান-পাট, গাছ-গাছালি দেখতেন। কখনো কখনো শুধু শুধু ঘুরে বেড়াতেন, আর কি যেন ভাবতেন। যখন রাতেরবেলা আকাশে চাঁদ হেসে উঠতো তখন তো কোন কথাই নেই। বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেন। পায়চারী করতেন গাছ-গাছালির ফাঁকে ফাঁকে। এক পা দু'পা করে এগিয়ে যেতেন ডাহুক ডাকা বাঁশঝাড়টার কাছে। চুপ-চাপ শুনতেন ডাহুকের একটানা ডাক। পরবর্তীতে তিনি এসব কথা তাঁর কবিতায় লিখেছেন—

রাত্রিভর ডাহুকের ডাক....
এখানে ঘুমের পাড়া, স্তব্ধ দীঘি অতল সুপ্তির
দীর্ঘ রাত্রি একা জেগে আছি।
ছলনার পাশা খেলা আজ পড়ে থাক
ঘুমাক বিশ্রান্ত শাখে দিনের মৌমাছি
কানপেতে শোনো আজ ডাহুকের ডাক

আবার—

তারার বন্দর ছেড়ে চাঁদ চলে রাত্রির সাগরে
ক্রমাগত ভেসে আসে পালক মেঘের অন্তরালে,
অশ্রান্ত ডুবুরি যেন ক্রমাগত ডুব দিয়ে তোলে
স্বপ্নের প্রবাল।

মাঝে মধ্যে তিনি বাড়ির পুচকে পুচকে পাইক বরকন্দাজ নিয়ে বেড়াতে বের হতেন। যেন রাজপুত্তুরের হরিণ শিকার। হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতেন মধুমতির তীরে। পলকহীনভাবে দেখতেন নৌকা, লঞ্চ, স্টীমার জাহাজের আনাগোনা। শুনতেন মাঝি-মাল্লার দাঁড় ফেলার শব্দ, হাঁক-ডাক। এসব দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যেতেন তিনি। চিন্তার রাজ্যে দাঁড় ফেলে ফেলে এগিয়ে যেতেন, নদী ছেড়ে সেই সমুদ্রে। এই সময় সাথী দলবলকে লক্ষ্য করে তাদেরকে ভূগোলের জ্ঞান

www.pathagar.com

দিতে চেষ্টা করতেন। বলতেন, "পাহাড় থেকে এসেছে এই নদী। তারপর চলে গেছে দক্ষিণে, সেখানে আছে বঙ্গোপসাগর, তারপর আরব সাগর। নৌকা চড়ে ভেসে যেতে কোন বাধা নেই, কোন মানা নেই। কিন্তু সাবধান, হুঁশিয়ার। আসবে ঝড়, উঠবে তুফান, বড় বড় কুমীর আর হাঙর মাতামাতি করবে। আল্লাহ আল্লাহ করে নৌকা ছাড়লে কোন ভয় নেই।'

বাল্যকালের সাথী 'মধুমতী'কে নিয়েও তিনি কবিতা লিখেছেন। যেমন–

জনতার কোলাহল নাই প্রশান্তির
স্বপ্ন মধুমতী
দুই পাশে শস্য ক্ষেত রেখে অবিশ্রান্ত
চলে সেই নদী
সূর্যাস্তের তোরণে যেখানে জ্বলে সন্ধ্যা
তারকার দ্বীপ
কর্কশ দিনের দাঁড়াকাক যেথা হলো স্তব্ধ
বাঁক।

[মধুমতি তীরে ঃ হে বন্য স্বপ্নেরা]

তোমরা তো পড়েছ রাজপুত্তুররা টগবগ করে ঘোড়া হাঁকিয়ে অথবা পংক্ষীরাজে চড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, সাত সমুদ্রের ঘাট পেরিয়ে চলে যায় সেই পরীর দেশে অথবা রাক্ষস-খোক্ষসদের রাজ্যে। তারপর সেখান থেকে উদ্ধার করে আনে রাজকন্যা অথবা কোন অলৌকিক সম্পদ। কিন্তু আমাদের আজকের আলোচিত রাজপুত্তুর চেয়েছিলেন অন্য কিছু। তিনি চেয়েছিলেন, আমাদের এই ঘূনে ধরা সমাজটাকে ভেঙ্গে একটা সুন্দর নতুন সমাজ গড়তে।

তার কথায়—

আল্লাহর দেওয়া বিশ্ববিধান
ইসলামী শরিয়ত
সে বিধানে মোরা গড়িয়া তুলিব
এই পাক হুকুমত।।
তৌহিদে রাখি দৃঢ় বিশ্বাস
আমরা সৃজিব নয়া ইতিহাস
দেবো আশ্বাস দুনিয়ার বুকে
দেখাব নতুন পথ।।
সারা মুসলিম দুনিয়াকে বেঁধে
একতার জিনজিরে

www.pathagar.com

ফিরায়ে আনিব হারানো সুদিন
নয়া জামানার তীরে।।
আলী, উসমান, উমরের দান
নেব তুলে মোরা জেহাদী নিশান
নেব মোরা ফের আবু বকরের
সত্য সে খিলাফত।।

কবি রাজপুত্তুরটির বিশ্বাস, আমাদের পূর্ব পুরুষদের অর্থাৎ আগের দিনে যারা জাতির নেতৃত্ব দিয়েছে, তাঁদের ত্রুটির কারণেই আজ মুসলিম জাতি এই খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছে। যেমন–

শুধু গাফলাতে, শুধু খেয়ালের ভুলে
দরিয়া অথই ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে,
আমাদেরই ভুলে পানির কিনারে
মুসাফির দল বসি,
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের
সেতারা শশী,
মোদের খেলায়ধূলায় লুটায়ে পড়ি
কেঁদেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্ববরী।

(পাঞ্জেরী)

সারা দুনিয়ায় নতুন করে আবার মুসলিম জাগরণ শুরু হয়েছে। আবার যেন নতুন সূর্য ওঠার একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সেদিকে ইঙ্গিত করে তিনি লিখেছেন—

কেটেছে রঙ্গিন মখমল দিন, নতুন
সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ
পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ ব'য়ে আনে
নোনা দরিয়ার ডাক,
নতুন পানিতে সফর এবার এ
মাঝি সিন্দাবাদ।

[সিন্দাবাদ]

কিন্তু আমাদের জাতির নেতা যখন হতাশ, সাহসহারা তখনো রাজপুত্তুর তার সাহসে ভর দিয়ে বলেছেন—

www.pathagar.com

আজকে তোমায় পাল ওঠাতেই হবে,
ছেঁড়া পালে আজ জুড়তেই হবে তালি,
ভাঙ্গা মাস্তুল দেখে দিক করতালি,
তবুও জাহাজ আজ ওঠাতেই হবে।

[সাত সাগরের মাঝি]

কবি রাজপুত্তুরটি তাঁর লেখার মধ্যদিয়ে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। এই দৃঢ় প্রত্যয়ী রাজপুত্তুরটি তার জীবনেও ইসলামী অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। কোন ঝড়, কোন বিপদ তাঁকে এ পথ থেকে চুল পরিমাণও সরাতে পারেনি।

তোমাদের মত ছোটদেরকে তিনি সাচ্চা মুসলমান হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য বলেছেন এবং পাহাড়ের মত অটল থেকে সকল বিপদ মুসিবতের মোকাবেলা. করতে বলেছেন। যেমন—

আমরা বাচ্চা তবুও সাচ্চা মুসলমান
পাহাড় যদিও টলে যায় তবুও টলে না প্রাণ।

তিনি বিপদ-মুসিবতের সময় ভেঙ্গে পড়াকে ঘৃণা করতেন। এই সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়াটাও মোটেই পছন্দ করতেন না। আজকে যারা ছোট, কাল তো তারাই বড় হবে, দেশ চালাবে। তাই তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন—

তোরা চাসনে কিছু কারো কাছে
খোদার মদদ ছাড়া
পরের ওপর ভরসা ছেড়ে
নিজের পায়ে দাঁড়া।

এমনিভাবে তিনি তার লেখার মধ্যে দিয়ে দেশ-জাতির মঙ্গল কামনা করেছেন।

তিনি তোমাদের জন্য অনেক ভালো ভালো বই লিখেছেন। যেমন- 'পাখির বাসা', 'হরফের ছড়া', নতুন লেখা', 'ছড়ার আসর', 'নয়া জামাত', 'চিড়িয়াখানা', ইত্যাদি। 'পাখির বাসা' বইটির জন্য তিনি ১৯৬৬ সালে ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়াও কবি পেয়েছেন-বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক, স্বাধীনতা পুরস্কার ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার। ◎ ১০৬

www.pathagar.com

এক সংগ্রামী চেচেন নেতা

জওহর দুদায়েভ

সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার এক মুসলিম জনপদের নাম চেচনিয়া। সত্যি কথা বলতে কি ১৯৯১ সালের ১লা নভেম্বরের আগে বাংলাদেশের মানুষ জানত না এই মুসলিম অধ্যুষিত জনপদ চেচনিয়ার কথা। এমনকি পশ্চিমা বিশ্বের সাধারণ জনগণও এ জনপদটির খবর রাখত না। ১৯৯১ সালের ২৫ ডিসেম্বর তারিখে যখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় দেশ রাশিয়া ১৫টি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে তখন চেচনিয়া স্বাধীনতার ডাক দেয়। রাশিয়ার পনেরটি প্রজাতন্ত্রের বাইরে নব্বইটি স্বায়ত্বশাসিত অঙ্গ প্রজাতন্ত্র এবং অঞ্চলগুলোর মধ্যে চেচনিয়া একটি।

৬০০০ বর্গমাইল আয়তনের এ ক্ষুদ্র জনপদের লোকসংখ্যা ১৯৯০সালের ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত ছিল ১২ লাখ ৮৯ হাজার ৭০০ জন। চেচনিয়ার রাজধানীর নাম গ্রোজনী। রাজধানী শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৪ লাখের ওপরে। গ্রোজনী শব্দের অর্থ দুর্দম্য, দুর্দান্ত, দুর্ধর্ষ, জাদরেল ইত্যাদি।

বর্তমানে যুদ্ধের কারণে সমগ্র চেচনিয়াতে মাত্র ৪ লাখের মত চেচেন অবস্থান করছে, বাকীরা পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। সাম্প্রতিক যুদ্ধে প্রায় দু'লক্ষের মত চেচেন মারা পড়েছে বলে জানা যায়। এর আগে ১৯৪৪ সালে স্টালিন সরকার গণহত্যার মাধ্যমে 'মুসলিম সমস্যা' সমাধানের লক্ষ্যে জোরপূর্বক ১২ লক্ষ (ঐ সময় চেচনিয়ায় ১২ লক্ষ মুসলমান ছিল) চেচেন মুসলিমকে কাজাখস্তানে নির্বাসনে পাঠায়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই ১২ লক্ষ চেচেন মুসলিমদের মধ্যে ৩ লক্ষই পথে মারা যায়।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, চেচনিয়ার পার্শ্ববর্তী দাগাস্থানের দ্বারবন্ধ শহরে ৬৪৩ সালে ইসলামের পতাকা উত্তোলিত হয়। এর আগে ৬৩৯ সালে আরবরা আজারবাইজান দখল করে নেয়। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে পুরো দ্বারবন্দ এলাকায় ইসলাম প্রসার লাভ করে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী চেচনিয়াতে ইসলাম প্রবেশ করতে সময় লাগে। যতদূর জানা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের দিকে চেচনিয়ায় ইসলাম ব্যাপকভাবে প্রবেশ করে এবং নকশাবন্দিগণের প্রভাবের ফলে ইসলাম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অবশ্য পণ্ডিতদের অনেকেই মনে করেন ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতকে চেচনিয়ায় ইসলাম প্রবেশ করে। ষোড়শ শতকের শেষ

www.pathagar.com

দিকে এসে চেচেন মুসলমানদের ওপর রুশ বাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়। ১৫৯৪ সালে মুসলিম বনাম রুশ বাহিনী উত্তর দাগাস্থানের পুলাক নদীর তীরে রুশ বাহিনীর মুখোমুখি হয়। হঠে যায় রুশ বাহিনী। ১৬০৪ সালে রুশ বাহিনী মুসলিম বাহিনীর ওপর আবার আঘাত হানে কিন্তু শোচনীয়ভাবে তারা পরাজিত হয়। সত্যিকার অর্থে মুসলমানরা রুশ খৃস্টানদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধেই বিরাট বিজয় ছিনিয়ে আনে। প্রকৃত পক্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুশ বাহিনীর সেই যুদ্ধের শুরু।

জাতীয়তার দিকে থেকে চেচেনরা আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। অধিকাংশ জনসংখ্যা তুর্কী বংশোদ্ভূত মুসলমান। নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় উভয় দিক থেকেই চেচেনরা রুশদের থেকে আলাদা। জার শাসন ও পরবর্তীকালে সত্তর বছরে কমিউনিস্ট শাসনামলে চেচেন মুসলমানদের চেতনাকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হলেও বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। ইতিহাস সাক্ষী চেচনিয়া কোন কালেই রাশিয়ার অংশ ছিলনা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জোরপূর্বক চেচনিয়াকে রুশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। বহুকাল ধরে রুশরা বারবার চেচেনদের ওপর হামলা চালিয়েছে কিন্তু চেচেন মুসলমানরা কোন সময়ই এ আধিপত্য মেনে নেয়নি, বরং তাদের বিরুদ্ধে ইমাম শেখ মনসুর উশুরমা (১৭৩২), শেখ মুহাম্মদ, গাজী মোহাম্মদ, গামজাতবেক, শে হাজী ইসমাইল, মোল্লা মোহাম্মদ, জামাল উদ্দীন ও ইমাম শামীলরা আপোসহীন জিহাদ পরিচালনা করেছেন। ১৮৫৯ সালের ২৫ আগস্ট ইমাম শামীল রুশ বাহিনীর কাছে সম্মানজনক আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। গুনিব গ্রামের এ যুদ্ধে ইমাম শামীলের সর্বশেষ ৪০০ মুরীদের প্রায় সবাই শহীদ হন। তারপরও ১৮৫৯-৬৪ সাল পর্যন্ত চেচেনরা ককেশাসের দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে আশ্রয় নিয়ে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চেচেনরা জার্মানিকে সমর্থন দেয়। এই অপরাধে স্ট্যালিন লক্ষ লক্ষ চেচেনকে অত্যন্ত অমানবিকভাবে কাজাখস্থানে নির্বাসন দণ্ড প্রদান করে তা আগেই উল্লেখ করেছি। এ নির্বাচনকালে ১৯৪৪ সালের ১৫ এপ্রিল শহীদ প্রেসিডেন্ট জওহর দুদায়েভ পিয়ার ভোমায়াস্কায়া এলাকার ইয়ালখের গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বার নাম মুসা এবং মার নাম আলেপতিনা কেদোরভনা দুদায়েভ। দুদায়েভের আব্বা ছিলেন জাতিতে চেচেন আর মা ছিলেন রুশ। তারা মোট ৭ ভাই-বোন। দুদায়েভ ছিলেন সবার ছোট। তার আব্বা ও বড় দুই ভাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেন। এই অপরাধে স্টালিন বাহিনী দুদায়েভের পিতা ও বড় ভাইকে শহীদ করে।

দুদায়েভ রাডিকাফ কাজে ইলেক্ট্রনিক্সের ওপর দু'বছর পড়াশুনার পর সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৬২ সালের রাশিয়ার তাম্বর শহরের বৈমানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তাঁর সামরিক শিক্ষা শুরু হয়। জাতিগতভাবেই রুশরা অন্তর

www.pathagar.com

থেকেই চেচেনদেরকে ঘৃণা করে। এরপরও জওহর দুদায়েভ আপন প্রতিভা বলে সমস্ত প্রকার বাধা অতিক্রম করে রাশিয়ার সেরা সামরিক স্কুল ইউরি গ্যাগারিন এয়ারফোর্স একাডেমী, মস্কোতে শিক্ষা লাভের সুযোগ পান। সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার গতানুগতিক নিয়মে দুদায়েভ ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। আসলে এ কারণেই তিনি তার চাকরিতে প্রমোশন পেয়েছিলেন। তিনি সহকারী কমান্ডার হিসেবে ১৯৬৬ সাল থেকে রাশিয়ান বিমান বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। ১৯৬৬-৭৬ পর্যন্ত তিনি ভাটা বোম্বার স্কোয়াড্রনের ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন। ১৯৭৬-৭৯ পর্যন্ত এয়ারফোর্স রেজিমেন্টের চীফ অব স্টাফ, ১৯৭৯-৮০ পর্যন্ত কমান্ডার অব ডিভিশন, ১৯৮৭-৯০ পর্যন্ত কমান্ডার অবডিভিশন এবং ১৯৯০ সালে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। এরপর দুদায়েভ ১৯৯০-৯১ সেশনের জন্য চেচেন জাতির মহাসম্মেলনের নির্বাহী কমিটির প্রধান ছিলেন। ১৯৯১ সালে তিনি চেচনিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং ১৯৯২ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদও অলংকৃত করেন।

জওহর দুদায়েভ আল্লা নাম্নী এক রুশ মহিলা কবিকে বিয়ে করেন। তাদের ২ ছেলে ও ১ মেয়ে ছিল।

দুদায়েভ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর তার মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও অতীত ঐতিহ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। ফলে চেচেন জাতির ভেতর তাদের পূর্ণ মুসলিমসত্ত্বা জাগ্রত হয়ে ওঠে। তারা সে বছরই দুদায়েভের নেতৃত্বে চেচনিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা করে, যে স্বাধীনতা ছিল চেচেন জাতির আবহমানকালের লালিত স্বপ্ন। চেচেনরা রুশদের বিরুদ্ধে যুগ যুগ ধরে সংগ্রাম করে এসেছে, বুকের তাজা রক্ত ঢেলেছে এ স্বাধীনতার জন্য। ১৯৯৪ সালের ১১ই ডিসেম্বর রুশ প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন যখন তার তিন ডিভিশন সৈন্যকে চেচনিয়া আক্রমণের নির্দেশ দেন তখন দুদায়েভ চেচেন জাতির আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে ওঠেন। চির সংগ্রামী চেচেন জনগণ তাঁর নেতৃত্বে সুশিক্ষিত বিশাল রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যে মরণপণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তা যে কোন স্বাধীনতাকামী জাতির জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

১৯৯৫ সালে দুদায়েভের বড় ছেলে রুশদের অস্ত্রে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে শহীদ হন। ১৯৯৬ সালের গোড়ার দিকে তার জামাতা সালমান রাদুয়েভ নিহত হন।

দুদায়েভের প্রিয় সখ ছিল কারাতে ও সঙ্গীত। তিনি পুশকিন ও লের মণ্ডভের কবিতা পড়তে ভালবাসতেন। কারণ ছিল এ দু'জন কবি ককেশাসকে অত্যন্ত ভালবেসেছিলেন এবং ককেশাসের ওপর তাদের খুবই জনপ্রিয় কবিতা আছে।

দুদায়েভ কুরআন তেলাওয়াত করতে ও শুনতে ভালবাসতেন। তিনি খুব ফুল প্রিয় লোক ছিলেন। যে কারণে ফুলের বাগান পর্যন্ত করেছেন।

www.pathagar.com

আকৃতিগত দিক থেকে জওহর দুদায়েভ আহামরি গেছের দেহের অধিকারী ছিলেন না। তিনি দৈহিকভাবে ছোটখাট একজন মানুষ ছিলেন। কিন্তু হলে কি হবে, এই ছোটখাট মানুষটি ছিলেন প্রাণোচ্ছল জীবন্ত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। এখনকার কিংবদন্তী।

চেচনিয়াকে নিয়ে ছিল তার সীমাহীন স্বপ্ন। তিনি চেয়েছিলেন চেচনিয়ায় স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি চেয়েছিলেন চেচনিয়ার মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। চেচনিয়াকে তিনি ১৯৯১-৯৪ পর্যন্ত তিন বছরের কিছু বেশী সময় স্বাধীন রাখতে পেরেছিলেন। সত্যি কথা বলতে এক দুদায়েভই ছিলেন চেচেন জাতির স্বাধীনতার প্রতীক। দুর্ধর্ষ ককেশীয় চেচেন জাতির প্রাচীন ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরাধিকারী।

আজাদী পাগল চেচেনরা পাহাড়ী অঞ্চলে নিজেদের অবস্থান ঠিক করে বিশাল রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ করে গত ২১ শে এপ্রিল ১৯৯৬ তারিখে চেচনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের অকুতোভয় মহানায়ক, চেচেনদের নয়নের মনি, চির সংগ্রামী নেতা জওহর দুদায়েভ স্যাটালাইট ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে গ্রোজানী থেকে ৩০ কি. মি. দূরে জেখেসু গ্রামের একটি মাঠে শাহাদাতবরণ করেন। এ সময় তিনি চেচেন সংকট নিরসনের জন্য মধ্যস্থতার ব্যাপারে স্যাটেলাইট টেলিফোনে আলাপ করছিলেন। জানা যায়, কাপুরুষ ইয়েলৎসিন বাহিনী কৌশলে স্যাটেলাইটে টেলিফোনের অবস্থান জেনে নিয়ে রুশ বিমান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। ইতিহাস বলে চেচেন মুসলমানরা আজাদী পাগল এক যোদ্ধা জাতি। সত্যিই তারা হাসি মুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন রতে পারে। আর যারা মৃত্যুকে ভয় পায় না, বিজয় তাদের অনিবার্য। হতে পারে সেটা সময় সাপেক্ষ। প্রেসিডেন্ট জওহর দুদায়েভ শহীদ হলেও চেচনিয়ার ঘরে ঘরে হাজার হাজার দুদায়েভ এখন তৈরী হবে, জন্ম নেবে। ◎

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট – ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২. ইরানের কবি – মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, বাংলা একাডেমী।

৩. ইরানের বুলবুল হাফেজ শিরাজী – মুমাম্মদ ঈসা শাহেদী।

৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস – মাহবুবুল আলম।

৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস – মোহার হোসেন সূফী।

৬. ছোটদের কবি কায়কোবাদ – দেওয়ান আবদুল হামিদ।

৭. শিশু সাহিত্য সধানায় কয়েকজন মুসলমান লেখক – আলমগীর জলিল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৮. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২য় খণ্ড ডিসেম্বর ১৯৮৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ;

৯. চরিতাভিধান, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী;

১০. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড – ডঃ সুকুমার সেন, কলিকাতা ১৯৪৩;

১১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত – মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা ১৯৫৬।

১২. ইসলামী বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড, ৩য় খণ্ড ও ১৫শ খণ্ড – সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

১৩. এম. রহমান সংকলিত – ইকবাল দেশে-বিদেশে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

১৪. আল্লামা ইকবাল – মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

১৫. বাংলা বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড ও ৪র্থ খণ্ড – মুক্তধারা।

১৬. মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্ দেশ কাল সমাজ – মুহম্মদ আবূ তালিব, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

১৭. রদ্দে খৃষ্টীয়ান ও দলিলুল ইসলাম – মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা।

১৮. মেহেরুল এছলাম (এছলাম রবি) – মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা।

www.pathagar.com

১৯. বিধবা গঞ্জনা বা বিষাদ ভাণ্ডার – মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা।
২০. মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ – আবুল হাসানাত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
২১. ছোটদের মুন্সী মেহেরুল্লাহ – জোবেদ আলী, প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ১৯৮৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
২২. ছোটদের মুন্সী মেহেরুল্লাহ – দেওয়ান আবদুল হামিদ।
২৩. ছোটদের সৈনিক মুন্সী মেহেরুল্লাহ – মুহাম্মদ জিলহজ আলী, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫, যশোর।
২৪. বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান – মুহাম্মদ শাহাদাত আলী আনসারী, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮৭, যশোর।
২৫. শেখ হবিবর রহমান – মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, প্রকাশকাল, ফেব্রুয়ারী ১৯৯০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
২৬. যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার – নাসির হেলাল, সীমান্ত প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯২।
২৭. ছোটদের জীবনী গ্রন্থ ৭ম খণ্ড, ১৪শ খণ্ড ও ২৪শ খণ্ড – আবদুস সাত্তার সম্পাদিত, আহমদ পাবলিশিং হাউস।
২৮. কবি বন্দে আলী মিয়া স্মারক গ্রন্থ – গোলাম সাকলায়েন সম্পাদিত।
২৯. অগ্রপথিক ২য় বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা ; পৌষ ১৩১৪ – অধ্যাপক আবদুল গফুর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
৩০. আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা – আবদুল ওয়াহিদ সম্পাদিত, জুন-আগস্ট ১৯৯১ সংখ্যা। ◎

www.pathagar.com

সুহৃদ প্রকাশন
বুকস্ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ISBN : 984-632-054-X
978 984 632 054 X

www.pathagar.com